দ্বিতীয় অধ্যায়

আশালতার গল্পবিশ্বে : বিষয় বৈচিত্র্য

বাংলা সাহিত্য জগতে আশালতা সিংহ অন্যতম লেখিকা। আপন রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি সমকালীন-উত্তরকালীন লেখিকাদের থেকে স্বতন্ত্র আসনে আসীন। আশালতার রচিত একের পর এক প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। আশালতার গল্পে আছে মানবজীবনের কথা, বিশেষ করে নারী জীবনের সুখ-দুঃখময় জীবনানুভূতি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে তাঁর প্রতিবেদনে। অন্যদিকে নিজের জীবন-সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতার কথাও রয়েছে তাঁর গল্পে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে আশালতার গল্প হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও বাস্তব। এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে আশালতার দুটি গল্প সংকলন। বিষয় বৈচিত্র্য অনুযায়ী এসমস্ত গল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

(১) প্রেমকেন্দ্রিক গল্প

(২) দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প

(৩) সমাজসমস্যামূলক গল্প

(৪) নারীকেন্দ্রিক গল্প

(৫) মনস্তত্ত্বমূলক গল্প

এছাড়াও শহর ও পল্লীগ্রামকে নিয়ে, তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আশালতার আরও গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।

(১) আশালতার প্রেমকেন্দ্রিক গল্প

বাংলা সাহিত্য জগতে আশালতা সিংহের ছোটগল্প এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সেকালের উচ্চবিত্ত সমাজের কাহিনি ছাড়াও পল্লীবাংলার জনসাধারণের জীবনচর্যা নিয়ে ছোটগল্পকে সাজিয়ে তুলেছেন আশালতা। 'দাম্পত্য জীবন', 'পুরুষতন্ত্রের প্রতিবাদ', 'নারীর সামাজিক অবস্থা' ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়

ছাড়াও আশালতার গল্পের একটি মুখ্য বিষয় প্রেম।

প্রেম মানব জীবনকে আবৃত করে রাখে। মা-সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ইত্যাদি প্রতিটি সম্পর্কই প্রেমের বন্ধনে একই সূত্রে বাঁধা। প্রেমই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই আসনে স্থান দিয়েছে। প্রেমই মানব মনের লুক্কায়িত কালিমাকে দূর করে সুন্দর মানবাত্মাকে গড়ে তোলে। আশালতা সিংহের 'রূপান্তর', 'ভালোলাগা' এবং 'সফলতা' গল্পে তেমনি প্রেমের ছবি পরিদৃশ্যমান।

'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রূপান্তর' গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪৫ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় সুনীলার জীবনে প্রেমের স্পর্শে আসে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। সুনীলা পরাশ্রিতা, মামার বাড়িতে থাকে। দেখতে সুশ্রী হলেও নিতান্ত অযত্ন-অবহেলার চিহ্ন তার সর্বদেহে। বরপক্ষ তাকে দেখতে এসে অপছন্দ করে। সুনীতির প্রফেসর স্বামীর ছাত্র বিনয় সুনীলাকে বিয়ে করে। হঠাৎ দুবছর পর দার্জিলিং যাওয়ার জন্য ওয়েটিংরুমে সুনীতির সংগে সুনীলার দেখা হয়। সুনীলা তখন সুনীতিকে স্বামীর গল্প বলায় ব্যস্ত। যে সুনীলা একদিন ফেরিওয়ালাকে কদর্য গালি-গালাজ করে, সেই সুনীলার মধ্যে এমন পরিবর্তন দেখে সুনীতির অভাবনীয় মনে হয়—

> *"এক হাজারবার লেকচার দিলেও যাহা হইত না, প্রেমের দ্বারা অতি অল্প সময়েই অবলীলাক্রমে তাহা হইয়াছে।"*[১]

প্রেম-ভালোবাসা-সহানুভূতির ছোঁয়ায় সুনীলার শুধু বহির্জগতেই নয় মনের জগতেও ঘটে যায় দারুণ পরিবর্তন। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গল্পেও বৌদি নারায়ণীর প্রেম-সহানুভূতির স্পর্শে দুরন্ত চঞ্চল বালক রামলাল মানুষ হয়ে পড়ে। 'সফলতা' গল্পেও তেমনি এক সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। গল্পটি অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, 'পাঠশালা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির মধ্যদিয়ে আশালতা

দেখিয়েছেন ছেলে-মেয়েদের শাসনের পরিবর্তে প্রেম-ভালোবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে পড়া শেখানো অনেক বেশী সহজ। সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান বিজয়কে নিয়ে তাঁর মা-বাবার অনেক স্বপ্ন। তাই বিজয়ের পড়ার জন্য পিতা-মাতা ও মামা মিলে রুটিন করেন যাতে সে খাওয়া-দাওয়া ও স্নান ছাড়া অন্য কিছুতে সময় নষ্ট করতে না পারে। প্রত্যেক বিষয়ে এক একজন শিক্ষক রাখা সত্ত্বেও ইংরাজী ও অংকে সে ফেল করে। বাবার চিকিৎসার জন্য বাড়ীর অন্য সদস্যরা কলকাতায় যাওয়ার কারণে তাকে বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য কাকার বাড়িতে থাকতে হয়। কাকার মেয়েদের পড়াশোনার ধরনে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে পড়াশোনার প্রতি তারও আগ্রহ জন্মায়। গল্পে আশালতা বিজয়ের মধ্যদিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন—

> *"স্নেহ ও মধুরতার সহিত শিখাইলে তাহার মত বোকা ছেলেকেও অল্প সময়েই একান্ত পাঠানুরাগী করিয়া তোলা যায়।"*[২]

'ভালোলাগা' গল্পে আশালতা দেখিয়েছেন কিভাবে নিঃস্বার্থ সেবা ও স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায় শহর থেকে আগত সুধাংশুর স্ত্রীর। জমিদার সন্তান সুধাংশু মায়ের মৃত্যুর পর গ্রামে স্ত্রী সহ আসে। সেখানে ছোটভাইয়ের স্ত্রীর নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেম দেখে সুধাংশুর স্ত্রী অভিভূত হয়ে পড়ে এবং গ্রাম সম্পর্কে তার যে ভুল ধারণা ছিল সব কিছু দূর হয়ে যায়। গল্পের শেষে দেখা যায় সুধাংশুর ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ছায়া সেখানে থাকতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে বনফুলের অন্যতম একটি প্রেমমূলক গল্পের কথা। এই গল্পটির মাধ্যমে প্রেমের এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন বনফুল। গল্পটির নাম 'বধুনী'। গল্পটির নায়ক বিল্টু বধুনীকে ভালোবেসে বিয়ে করে। গল্পের প্রথম দিকে লক্ষ্য করা যায় ধনুকধারী বিল্টু শিকারে বেরিয়ে এক মহুয়া গাছের তলায় বধুনীকে প্রথম আবিষ্কার করে। হাজারী বাগের পার্বত্য অধিবাসী

বিল্টু সন্তান জন্মের পরে বধুনী ও তাঁর মধ্যে ভালোবাসার অন্তরায় মনে করে নিজের সন্তানকে হত্যা করে। উপজাতি যুবক বিল্টু ও জংলী যুবতী বধুনীর প্রণয়লীলার মধ্যে প্রেমের এক নতুন তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেন বনফুল। ভালোবাসার জন্য ছেলেও হয়ে ওঠে তৃতীয়পক্ষ। যাকে মেনে নিতে পারেনি পিতা। এমনকি ভালোবাসার জন্যে স্বামীর কর্তব্যকর্মের দিকটাও তুচ্ছ হয়ে যায়।

আশালতার 'তরুণ প্রতিবেশী' গল্পটিও প্রেমকেন্দ্রিক গল্প। গল্পটি সাপ্তাহিক ছোটগল্পে, ১৩ ভাদ্র ১৩৪০ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটি বিমলা নামে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে লেখা। বিমলা বাড়ির বড় মেয়ে, তাঁর মায়ের শরীর ভালো না থাকায় সে তার ভাই-বোনদের নিয়ে শিমুলতলা, মুসৌরি নামে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়, তারপরও মার শরীর সুস্থ না হওয়ায় সে দুমকাতে আসে। সেখানে তাদের প্রতিবেশী একজন বিমলার সাময়িক কাগজে লেখা পড়ে তাদের বাড়িতে আসেন। বিমলার প্রতি তাঁর মনে কোথাও একটু জায়গা ছিল ঠিক তেমনি হয়তো বিমলারও। তাই দুবছরের ছোটবোন কমলার বাসররাতে যখন সেই প্রতিবেশী বিমলাকে কেন্দ্র করে নবপরিণিতা স্ত্রী কমলাকে নানা কথা বলে যাচ্ছেন তখন বিমলা লুকিয়ে কথাগুলি শুনতে-শুনতে ভাবে—

> *"সে যদি জিনিয়াস এবং দেবী না হয়ে শুধু আর দুবছর পর জন্মাত"*[৩]

তাহলে প্রতিবেশীকে স্বামীরূপে পেতে পারত। এখানে বিমলার অন্তর্লোকে প্রতিবেশীর প্রতি সুপ্ত প্রেম জেগে ওঠে।

'মঞ্জরীর বেহায়াপনা' ও 'প্রতিক্রিয়া' নামে আশালতার আরও দুটি গল্পে দেখা যায় অতীত প্রেমের স্মৃতিচারণ। 'মঞ্জরীর বেহায়াপনা' গল্পটি আশালতা সিংহের গল্প সংকলন প্রথমখণ্ডের অগ্রন্থিত গল্প পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় প্রথমে পিতা সুরসুন্দরের মঞ্জরীর সঙ্গে নরেশের বিয়েতে আপত্তি ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে পিতার সম্মতিতে রাঢ়ী-বারেন্দ্র তফাত থাকা সত্ত্বেও মঞ্জরী ও নরেশ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাদের সেই বাধা ডিঙানোর আনন্দে উচ্ছ্বসিত মঞ্জরী ও নরেশের বেহায়াপনার কথা শুনে মহিলা সমিতির সম্পাদক সুমিত্রাদেবী চটে যান। একদিন শীতের শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন রেসকোর্সে হাটার সময় অশ্বত্থগাছের তলায় মঞ্জরী ও নরেশকে দেখে মনে পড়ে যায় পুরোনো সেই দিনের কথা। মনে হয় সেও কাউকে ভালোবেসেছিল কিন্তু জাত ধর্মের ভিন্নতাই তাদের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ভালোবাসার মানুষ থেকে দূরে যেতে হয় তাকে। এখানে আশালতার জীবনের সংগে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আশালতার জীবনেও দেখা যায় জাতের ভিন্নতার জন্য হেমেন্দ্রলাল রায়কে ভালোবাসলেও স্বামীরূপে পেতে পারেননি তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগে বিয়ের পরও হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। দিলীপকুমারের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়—

> *"দুজনে অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছে। আশার স্বামী সম্ভবত আশাকে আর তার সংঙ্গে দেখা করতে দেবে না।"*[৪]

অতীত প্রেমের স্মৃতি স্মরণের মধ্য দিয়ে আশালতার ভাবনার প্রকাশ গল্পে। সুমিত্রা দেবীর মাধ্যমে আশালতা বলতে চেয়েছেন যে, জাতের ভিন্নতার জন্য তাদের প্রেম দাম্পত্যে পৌঁছতে পারেনি বটে, কিন্তু অপ্রাপ্তিকে লুকিয়ে রেখে মঞ্জরীর অভিভাবকের মতো প্রেমকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ব্যক্তিজীবনের অপ্রাপ্তিকে মঞ্জরীর মধ্যদিয়ে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। 'প্রতিক্রিয়া' গল্পটি আশালতা সিংহের গল্প সংকলনের প্রথমখণ্ডের 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৪৭ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে

দেখা যায় ইলা নামে মেয়েটি রাত ৯-১০টা পর্যন্ত লেকের বেঞ্চে বসে কারো সঙ্গে গান গায়। রাত ১২টায় বাড়ি ফিরে দোতালার বারান্দায় মিষ্টিসুরে কারো সংগে কথা বলে। তার এই বেহায়াপনার জন্য সমাজের অন্য মেয়েরা খারাপ হবে ভেবে নির্ম্মলা আদর্শ মহিলা হিসেবে মেয়েদের চারিত্রিক গুণাবলীকে সুশৃঙ্খলিত রাখা কর্তব্য মনে করেন এবং ইলার পিসির কাছে অভিযোগ করেন। সেই ইলাকে কেন্দ্র করে নির্ম্মলাদেবীর পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। এক ঝড়ের রাতে প্রেমিক নরেন রজনীগন্ধার গুচ্ছ হাতে নিয়ে নির্ম্মলাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসে। নির্ম্মলার পিতার নির্ম্মলাকে নরেনের সংগে বিয়ে দেওয়ায় আপত্তির কারণ ছিল, প্রথমতঃ— নরেনের পদবী সাহা। আর দ্বিতীয়তঃ— নরেনের মা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা স্বীকৃতি না পাওয়ার পেছনে একমাত্র কারণ পদবীকেন্দ্রিক অসম্মতি অথবা অন্য কোনো বিষয়ক আপত্তি। তাই অভিভাবকদের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যেতে হয় তাদের। কাল প্রবাহে কখনো বা বিস্মৃতি ঘটে আবার কখনও তা কোনো না কোনো ঘটনাচক্রে বা কোন কিছুর মাধ্যমে অতীত স্মৃতি জেগে ওঠে।

আশালতা সিংহের অন্যতম একটি প্রেমকেন্দ্রিক গল্প হল ‘রমা’। গল্পটি আশালতা সিংহের দ্বিতীয় গল্প সংকলনের ‘অন্তর্যামী’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি উত্তরা পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৪১এ প্রকাশিত হয়। মোট ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। রমার বাড়িতে আসা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় খদ্যোত রমাকে ভালোবেসে ফেলে। রমা খদ্যোতের প্রচেষ্টায় সঙ্গীত, আদব-কায়দায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠে। তারপর রমার বিয়েও ঠিক হয়ে যায় আর খদ্যোত টাটাতে চাকরি নিয়ে চলে যায়। খদ্যোতের এই চলে যাওয়ার পেছনে রয়েছে রমার প্রতি তার লুক্কায়িত প্রেম। সেতার, এস্রাজ গুছিয়ে না নেওয়ার কারণ রমা জানতে চাইলে খদ্যোত বলে—

“সঙ্গে যা নিয়েছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর

কিছুর হবে না প্রয়োজন।"[৫]

জড় পদার্থ নয়, স্মৃতিকে সাথী করেই সে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে। খদ্যোতের স্নেহ ও ভালোবাসার স্পর্শে রমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হয়। গল্পটি প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> *"অন্তর্যামী গল্প সমষ্টির মধ্যে 'রমা' গল্পটির বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মৌলিকতার দাবি করিতে পারে। ইহাতে সস্নেহ অনুযোগের দ্বারা একটি কিশোরীর মনের উপর হইতে জড়বুদ্ধি ও কুশ্রীতার স্থূল যবনিকা সরিয়া গিয়া উহার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় কিরূপে ধীরে-ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার চমৎকার বর্ণনা।"*[৬]

মানবজীবনে প্রেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশালতার 'বিরহ' (দেশ পত্রিকা, ৯ অক্টোবর ১৯৩৭) নামে গল্পটিতে মিলন ও বিরহের সন্নিবেশে সুজিত ও মনিমালার প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সুজিত ও তাঁর বন্ধুদের আড্ডার বিষয় ছিল প্রেম। এই প্রেমকেন্দ্রিক আলোচনায় শেষপর্যন্ত সুজিত বলে—

> *"বিরহ প্রেমের একমাত্র কষ্টিপাথর, এখানে যাচাই না করে বলবার যো নেই ওর মধ্যে কতটা খাদ রয়েছে তার কতটা আর আসল।"*[৭]

সুজিত তার আর মণিমালার প্রেমকে যাচাই করতে গিয়ে দুজনে একে অপর থেকে দূরে থাকবে এরকম সিদ্ধান্ত নেয়। মণিমালা ভাইয়ের ছেলের মুখেভাত উপলক্ষে কিছুদিন এলাহাবাদে থাকার পর মণিমালার অনুপস্থিতিতে সুজিত একাকিত্ব অনুভব করে। এই দূরত্ব মণিমালা ও সুজিতের সম্পর্ককে

আরও গভীর করে তোলে। বিরহ প্রেমকে গভীরতা প্রদান করে। বিরহানলে জ্বলতে-জ্বলতে প্রেম খাঁটি সোনার মতো হয়ে ওঠে।

'বিরহ ও মিলন' আশালতা সিংহের আরেকটি অন্যতম প্রেমমূলক গল্প। গল্পটি 'মধুচন্দ্রিকা' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ এ প্রকাশিত হয়, গল্পটিতে আশালতা দেখিয়েছেন অমলা এক বৎসর পর বাবার বাড়িতে আসে কিন্তু তাঁর মন সেখানে কিছুদিন থাকার পর স্বামীর বিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিরহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অমলা বড় ভাইয়ের সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে চলে আসে। সেদিনই দেখা যায় স্নানের ঘরে দরজা লাগানো নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তখন অমলার মনে হয়—

> *"বিরহে যাহা অত সুকোমল অত সুকুমার ছিল*
> *মিলনে তাহাই কি এত রূঢ়, কর্কশরূপে দেখা দেয়?*
> *বিরহ এবং মিলনের রূপে কি এত তফাৎ! তাই*
> *বুঝি জগতের যত অমর কাব্যে বিরহেরই জয়গান।"*[৮]

মিলনের বিপরীত দিকে রয়েছে বিরহ। এই বিরহ প্রেমের গভীরতা নিয়ে আসে। কাছে থাকলে একজনের গুরুত্ব ততটুকু বোঝা যায় না যতটুকু বোঝা যায় সেই ব্যক্তি থেকে দূরে সরে গেলে, গল্পে অমলা দূরত্বে থাকার জন্যই স্বামীর মূল্য বুঝতে পেরেছিল।

প্রেমের প্রথমস্তর পূর্বরাগ, কখনও প্রেমিকাকে দেখে প্রেমিকের আবার কখনও প্রেমিককে দেখে প্রেমিকার মনে পূর্বরাগ জেগে ওঠে। কিন্তু পূর্বাপর সেই প্রেম একইভাবে থাকে না, কখনও সম্পর্কে আসে দূরত্ব কখনও বা আরও গভীর হয়ে ওঠে। সুতীক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারিণী আশালতা সব কিছুই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি পূর্বরাগের মতো অন্যতম একটি প্রেমকেন্দ্রিক গল্প লিখতে পেরেছিলেন।

'পূর্বরাগ' গল্পটি 'উত্তরা' পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে রয়েছে ইলা ও পল্লব ব্যানার্জির পূর্বরাগ। বিয়ের পূর্বে ইলার ভাবনা ছিল যাকে বিয়ে করবে তাঁর প্রেম অর্থাৎ ভালোবাসা যাচাই না করে বিয়ে করলে সংসারে অশান্তি আসতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে বিয়ের কিছুদিন পর দেখা গেল তাঁর যাচাই করা প্রেমেও অনেক পরিবর্তন। কখনও দেখা গেল ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে শুরু হচ্ছে তাঁদের মধ্যে তিক্ততা। সেই ভালোবাসার দিনগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আশালতার আরও কয়েকটি গল্পে প্রেম বিষয় রূপে ওঠে এসেছে। এসব গল্পের মধ্যে রয়েছে 'আশঙ্কা', 'প্রেমে পড়া', 'নারী চরিত্র' প্রভৃতি। 'আশঙ্কা' গল্পে আশালতা সুচরিতা ও অমলের প্রেমের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায় অমল পরীক্ষায় ভালো ফলের কারণে বিলেত যাওয়ার সুযোগ পায়। যাওয়ার পথে কলকাতাতে সুচরিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সুচরিতাকে সে ভুলে যাবে কি? একথার উত্তর জানাতে গিয়ে সে বলে এর উত্তর তাকে সমগ্র জীবন ধরে দেবে। অমল ও সুচরিতার মনোজগতের ভাবনা পাঠকদের মনোজগতকে ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে জর্জ মোহিতমোহন ভালোবেসে এক সঙ্গে থাকার ইচ্ছে নিয়ে রাতে পালিয়ে যেতে চাইলেও ক্ষীরোদা অর্থাৎ হেমশশী একসময় তাঁর পরিবারকে ফেলে যেতে পারেনি। গল্পে দেখা যায় নিজের সন্তানকে মারার অপরাধে বিচারে মৃত্যুদণ্ড পেলেও ক্ষীরোদা ফাঁসির দুদিন আগে মোহিতমোহনের দেওয়া আংটি যা তার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল তার জন্য সে প্রহরীর সঙ্গে ঝগড়া করে। পরে আংটিটি দেখে চিনতে পেরে মোহিতমোহনের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। বুঝতে পারেন যে, ক্ষীরোদা অর্থাৎ হেমশশী তাঁকে মন থেকে অত্যন্ত ভালোবেসে ছিল। তাই মৃত্যুর দুদিন আগেও তাঁর দেওয়া আংটি নিজের থেকে দূরে সরাতে চায়নি। গল্পটি আমাদের মনোলোকে করুণ অনুভূতির জন্ম দেয়।

আশালতার 'প্রেমে পড়া' গল্পটিতেও দেখা যায় প্রেমকে কেন্দ্র করে

উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে অলকার জীবনে এক ব্যতিক্রমী ধারণা রয়েছে। তাঁর মতে বিয়ের আগে একবার প্রেমে পড়া উচিত। তবে দাম্পত্যে অসুবিধে হয় না, অলকার প্রেমের অনুভূতিগুলি কখনও উপন্যাসের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে ঔপন্যাসিক অলকানন্দার লেখনী হিসেবে পাঠকের কাছে এসেছে। 'নারীচরিত্র' গল্পেও প্রেমের একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে উঠে আসে। গল্পে প্রেমবিষয়ক নারীমনের রহস্যময়তা ও অনুচ্চারিত ভাবনাকে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন আশালতা। গল্পটি 'উদয়ন' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪১ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় বান্ধবী ইন্দিরার দেওরের বিয়ের প্রস্তাব মাধবী প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু একসময় সে অনুপযুক্ত এক বৃদ্ধ ম্যাজিস্টেটকে ভালোবেসে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভালোবাসার কাছে রূপ, গুণ, যোগ্যতা যে তুচ্ছ হয়ে যায় তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে। 'অন্তর্যামী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অন্তর্যামী' গল্পটিও প্রেমকেন্দ্রিক গল্প। গল্পটি 'উত্তরা' পত্রিকায়, ভাদ্র ১৩৪০ এ প্রকাশিত হয়। ঘৃণার আড়ালে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসাকে আশালতা এ গল্পে দেখিয়েছেন। অমলা ও তাঁর স্বামী অমিয়র পূর্বপরিচিত ছিল সুকুমার। অমলা সুকুমারকে সব সময়ই ঘৃণা করে। এমনকি সুকুমার অমলার নামে উৎসর্গীকৃত কবিতার বইকেও অমলা সমালোচনা করেছে। কিন্তু অমলার সমালোচনা ও ঘৃণার আড়ালে লুকিয়ে ছিল সুকুমারের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। গল্পের শেষে অমলার সুকুমারকে বলতে শোনা যায়—

> *"একদিন আমিও সমস্ত মন দিয়ে চেয়েছিলুম যাতে চিরদিন আপনাকে ঘৃণা করে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু মিথ্যে ধোপে টেঁকেনা।"* [৯]

আলোচ্য গল্পে আশালতা নারীর অন্তর্জগতের রহস্যকে উদঘাটন করেছেন নিপুণ হস্তে। আশালতার সমকালীন এবং উত্তরকালীন লেখিকাদের লেখনীতেও প্রেম বিষয়রূপে এসেছে। নারীজীবনে প্রেমকেন্দ্রিক সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক

প্রথার সঙ্গে প্রেমের বিরোধও অনুরূপা-নিরুপমার লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিরুপমাদেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসে দেখা যায় মূকবধির (শ্যামলী) মেয়েরও স্বাভাবিক মেয়ের চেয়ে ভালোবাসার তৃষ্ণা কিছু কম থাকে না। আশালতা তাঁর বিভিন্ন প্রেমকেন্দ্রিক গল্পের আলোকে মানবজীবনে প্রেমের ভূমিকা ও গুরুত্ব কতটুকু তা অত্যন্ত নিঁখুত ভাবে চিত্রিত করেছেন।

(২) দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প

নর-নারীর সম্পর্ক যা সমাজ নির্ধারিত বৈবাহিক সূত্রে গৃহীত তাই-ই দাম্পত্য। মানবজীবন বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। তবে মা-সন্তান, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক। একজন নারী বা পুরুষ বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছে যথাযথ সময়ে তাঁর জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বেছে নেয়। আজীবন সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় তাঁর পাশে থাকে। তাই-ই দাম্পত্য সম্পর্ক। তবে আমাদের সমাজে এ ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কেরও ছবি দেখা যায়, যেখানে সত্তা নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্বামীর হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ায়। আশালতা সিংহের গল্পের বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে দাম্পত্য বা পরিবার। দাম্পত্যজীবনে মেয়েদের যে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় আশালতা এসব গল্পের মধ্যদিয়ে নিঁখুতভাবে তাই-ই বর্ণনা করেছেন। আশালতা সিংহের গল্প সংকলনের দ্বিতীয়খণ্ডের অগ্রন্থিত গল্প 'দাবি'। 'গল্পভারতী'তে ৭ম খণ্ড, চৈত্র ১৩৫২এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় মঞ্জু বিয়ের কিছুদিন পর বাপের বাড়ি যায় আই.এ. পরীক্ষা দেবে বলে। কিন্তু শাশুড়ীর অসুস্থতার জন্য শ্বশুরালয়ের রান্নাঘরের ভার তাকে নিজের ওপর নিতে হয়। মঞ্জুলার আর আই.এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় না। যে মঞ্জু শেলী, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ পড়ত তাঁর উদয়াস্ত রান্না ও রোগীর সেবায় সময় অতিবাহিত হতে থাকে, পড়ার সুযোগ করতে পারে না। রান্নাঘরই তাঁর জীবনের একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়। মঞ্জুলার মতো ভারতবর্ষের প্রায়

মেধাবী মেয়েদের যে এই ভবিতব্য ছিল সে সময়ে আশালতা মঞ্জুলার মধ্যদিয়ে তা দেখিয়েছেন।

'রান্নাঘর' গল্পেও মেয়েদের জীবনের একই অবস্থার ছবি অংকিত করেছেন আশালতা। 'রান্নাঘর' আশালতা সিংহের গল্প সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডের অগ্রন্থিত গল্প পর্যায়ের অন্যতম একটি গল্প। গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায়, ২৫ জানুয়ারি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে আশালতা সুধীরা চরিত্রের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের মেয়েদের চেনাপরিচিত দিনলিপির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। যাঁদের সুধীরার মতো রান্নাঘরের নিরন্তর কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়। খাদ্যবিলাসী দোর্দণ্ডপ্রতাপ রমেশের মতো স্বামীদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হয়। আবার কোন কারণে একটু ত্রুটি পেলেই তাঁদের উপর নেমে আসে সমালোচনার ঝড়।

গল্পে দেখা যায় রমেশ খবরের কাগজ পড়াকালীন সুধীরা কি ঘটনা হয়েছে জানতে চাইলে কর্কশস্বরে রমেশকে বলতে শোনা যায়—

> *"তাতে তোমার কি? কাগজের ভাবনা রেখে এমন হাত চালিয়ে রান্নাটা সেরে নাও দেখি বেলা কত হলো সে খেয়াল আছে?"*[১০]

রমেশের মতো স্বামীদের ধারণা রান্নাবান্নার বাইরে মেয়েদের কিছু জানার নেই। সুধীরার মতো এমন শত-শত মেয়েদেরও 'রাধার পর খাওয়া' আর 'খাওয়ার পর রাধা' এমন আবর্তনের মধ্য দিয়েই আজীবন কেটে যায়। এ প্রসঙ্গে মনে আসে গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' উপন্যাসের জমিদার বাড়ির নবাগত বউ যার কিনা পূজাপার্বন ও নিরন্তর কর্মব্যস্ততায় শ্বশুরালয়ে দিনরাত অতিবাহিত হয়। আশালতার 'রান্নাঘর' দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প হলেও আলোচ্য গল্পের মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থানটিকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন

তিনি।

'অতিথি' গল্পটি দাম্পত্য ও পরিবারনির্ভর গল্প। গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায়, পৌষ ১৩৪৫এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে রয়েছে প্রতিমার দাম্পত্য জীবনের ছবি। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে তার সংসার। পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিমা মামার কাছেই বড় হয়েছে। গল্পে দেখা যায় সন্তোষও তার বন্ধুরা গান শুনে বিয়ের আগেই প্রতিমার প্রশংসা করেছিল। কিন্তু বিয়ের পর সাংসারিক চাপের জন্য তার জীবন থেকে গান হারিয়ে যায়। লেখিকা আশালতাকেও সাংসারিক চাপে বাধ্য হয়ে সংগীতের জগত থেকে সরে যেতে হয়। দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের চাপে যেমন প্রতিমার জীবন ধারাতে পরিবর্তন আসে তেমনি তার আচরণ এবং ভাষাতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। একদিন তাদের বাড়িতে স্বামীর বন্ধু সন্তোষ, যে বিয়ের আগে তার গানের প্রশংসা করেছিল তার আগমনে ঘটে। তার ধারণায় প্রতিমার জীবনে গান হারিয়ে যাবার পেছনে দায়ী সাংসারিক চাপ। অন্যদিকে প্রতিমার স্বামীর ধারণা সংসারের কাজ নিপুণ হস্তে করতে পারলেই উত্তম নারীর অভিধা পাওয়া যায়। সন্তোষের আগমনে প্রতিমার মনে হয়েছে সে শুধু সামান্য মেয়েমানুষ নয়, এর বাইরেও তার আরেকটি সত্তা আছে, সেখানে সে একজন শিল্পী, এক স্বতন্ত্র সত্তা।

বিয়ে কীভাবে মেয়েদের নিজস্বতা, স্বতন্ত্রতা শুষে নিয়ে তাঁদের নিঃস্ব, পঙ্গু করে দেয় আশালতার 'স্বপ্নের অর্থ' ও 'বিসর্জ্জন' গল্প দুটি তারই উদাহরণ। 'স্বপ্নের অর্থ' গল্পটি 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি 'সচিত্র ভারত'-তে, ১৫ পৌষ ১৩৪৫ এ প্রকাশিত হয়। 'স্বপ্নের অর্থ' গল্পে দেখা যায় বন্ধু অতুল সুজাতা ও প্রকাশের বিয়ের প্রায় বছর আড়াই এর পরের একটি দিনের দৃশ্য স্বপ্নে দেখেছে। সুজাতা গানবাজনায় পারদর্শী ছিল কিন্তু নিরন্তর সাংসারিক কর্মব্যস্ততার চাপে তাঁর আর গান বাজনা করার সুযোগ হয় না। একদিন তাঁদের বাড়িতে এসে মুন্সেফ হিমাংশু ও কলকাতার কয়েকজন বন্ধুরা সুজাতার হাতে

ম্যাণ্ডেলিন শুনবে বলে আবদার করলে সুজাতা বলে 'ওসব আর এজন্মে নয়'। বন্ধু অতুলের এই স্বপ্নের মধ্যদিয়ে আশালতা দাম্পত্যজীবনের বাস্তব ছবি দেখিয়েছেন। নারীর প্রতিভা বিনষ্ট হওয়ার জন্যে দায়ী সাংসারিক জীবনের নিরন্তর কর্মব্যস্ততা এবং অনভ্যাসজনিত পরিস্থিতি। নিরন্তন কর্মের টানাপোড়নে বিধ্বস্ত হয়ে যায় নারীদের যাবতীয় আশা-আকাঙক্ষা। ফলে প্রায় সময়ই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইচ্ছাকে নিজের হাতে গলাটিপে মেরে ফেলতে হয় নারীকে। 'বিসর্জ্জন' গল্পটিতে আশালতা দেখিয়েছেন যে, বিয়ে নারীর নিজস্ব ভাষাকে গ্রাস করে নেয় অথচ নারী সেটা বুঝতেই পারে না। যে উজ্জ্বয়িনী সাহিত্যিক অপূর্বের রচনার প্রত্যক্ষ সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বিয়ের পর সেই-ই অপূর্বের সকল কথাকে হুবহু নকল করে বলে যায়।

বৈবাহিক জীবনে দায়িত্ব কর্তব্যের টানাপোড়েনে মেয়েদের অনেক স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে, আশালতা গল্পের মাধ্যমে এই বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিচয় করান। কিন্তু নারীজীবনে বিয়ের প্রয়োজন নেই একথা তিনি বলেননি। সেকালের সমাজে বাঙালি বিবাহিত মেয়েদের জীবন ছিল কঠোর নিয়মনীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের জন্য শ্বশুরালয়ে নির্ধারিত ছিল এক হাত লম্বা অবগুণ্ঠন আর অন্তঃপুরের দমবন্ধ পরিবেশ। এই দমবন্ধ পরিবেশে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি কোন বাড়িতেই নেই তাঁদের অধিকার। তাই সত্তর দশকের কবি কৃষ্ণা বসুর মধ্যেও এই অপ্রাপ্তির জন্যে রয়েছে খেদোক্তি—

"বিয়ের আগের বাড়ি, বিয়ের পরের বাড়ি,
বলো কোন বাড়ি আমার নিজের অধিকারে?

.....

মাগো, বলে দাও, আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে?
মেয়েদের নিজেদের বাড়ি থাকে কোনোদিন?"

আশালতার 'যাত্রা' গল্পে নবপরিণীতা অসীমারও শ্বশুরালয়ে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে,

> *"বাঙালী পরিবারের মেয়েদের পক্ষে বেশী খোলা আলো-বাতাস ভালো নয়।"*[১১]

হাতিবাগানের রমানাথবাবুর পুত্রবধূ ও শশাঙ্কের স্ত্রী অসীমা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী আসা মাত্রই বাড়ির মহিলারা নববধূর অবগুণ্ঠন নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। শশাঙ্কের বন্ধুরা তাঁর স্ত্রীকে দেখতে চাইলে মায়ের কাছে নববধূ কেন ঘোমটা দিয়ে জড় পুত্তলির মতো বসেনি— তাই নিয়ে প্রৌঢ় মহিলাদের কাছে সমালোচিত হতে হয় তাকে। সেকালের মেয়েদের এই এক হাত লম্বা অবগুণ্ঠনের কথা রাসসুন্দরী দেবীও জানিয়েছেন—

> *"বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাত খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সংগে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেখানে এখনকার মতো চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকল কাজ করিতাম। ... সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনদিকে দৃষ্টি চলিত না।"*[১২]

নববধূকে স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে শাশুড়ী অনেক কিছুই বলেন। অসীমার এরপর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এখানে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট পুরোনো রীতি-নিয়ম আর সংস্কার। এরা পুরোনো মূল্যবোধকে আঁকড়েই

বেঁচে আছেন। আধুনিক মানসিকতার অধিকারী হয়েও শেষপর্যন্ত গতানুগতিক বাঙালি সমাজের নিয়মনীতিতেই ফিরে যেতে হয় অসীমাকে। এখানে আশালতা দেখিয়েছেন পুরুষপ্রধান সমাজের সেই রক্ষণশীল মনোভাবনার জন্য শিক্ষিত মেয়েদের বিয়ের পর কতটা অপমান-লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর প্রোজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে লেখিকা আশালতার জীবনেও। আশালতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ করতে চাইলেও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আশালতাকে যেতে দেননি শুধু তিনি পুরুষ বলে। আশালতা জানিয়েছেন—

> *"এঁরা ওসব চাইতেন না। বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পছন্দ করতেন না। ফলে বাইরের জগতের সংগে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।"*[১৩]

অসীমার মতো মেয়েদের নিজের আশা-আকাঙক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের বিশ্বাস এবং আচরিত জীবনধারাতেও পরিবর্তন আনতে হয়। পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের সবসময় মেয়েমানুষ বলে হেয় চোখে দেখা হয়। কথায়-কথায় মনে করিয়ে দেওয়া হয় সে মেয়েমানুষ। আগে মেয়ে পরে মানুষ। তাঁর কিছু করার ক্ষমতা নেই। এমনকি, পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট এমন ধারণাও সমাজ পোষণ করে, দাম্পত্যে মেয়েদের ভূমিকা কতটুকু ও তাঁদের সম্পর্কে সমাজ কী ধারণা পোষণ করে 'মেয়ে মানুষ' গল্পে আশালতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায়, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। 'মেয়েমানুষ' গল্পে দেখা যায় ললিতার বিয়ে হয় সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে। বিয়ের পরবর্তী সময়ে ললিতার শ্বশুর ও নন্দাই-এর কথাবার্তায় সে বুঝতে পারে পরিবারে নারীর অবস্থানের স্বরূপ। বউভাতে এক সংগে ছেলে-মেয়েদের নিমন্ত্রণ করা নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে বলেন—

> *"তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতো থাকা তোমার*

এসব কথায় থাকবার দরকার কি? আর বোঝই বা তুমি কি?"[১৪]

একই ভাবনার সুর শোনা যায় নন্দাই এর কণ্ঠে—

"কে বলেছিল সর্দারি করে তোমাকে কাপড় আনতে। জান আমি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাড়া কাপড় পরিনে। এই চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ঠোঁটি কাপড় নিয়ে আমি করব কি? মেয়েমানুষের মত থাকলেই তো পার। মোড়লি করতে আস কেন?"[১৫]

পিতৃতন্ত্রের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারীকে নিরন্তর মেয়ে বলে সমাজের রক্ষণশীলতার শিকার হতে হয়। গল্পে দেখা যায় ললিতার শাশুড়ী ও ননদ পিতৃতন্ত্রের সংকীর্ণ মনোভাবনার শিকার। যাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেই অধিকার। আধুনিক সভ্য সমাজেও তাদের পরিচয় শুধু মানুষ হিসেবে নয়, মেয়েমানুষ হিসেবে। সেখানে তারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত। এই আধুনিক সভ্য সমাজে নারীর দশা দেখে মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন—

"আদিবাসী সমাজ আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের থেকে অনেক সভ্য। কারণ সেখানে ধর্ষণ নেই, যৌতুক, খুন নেই এক তরফা বউ পেটানো নেই।"[১৬]

আশালতার আরও বেশ কয়েকটি গল্পে দাম্পত্যজীবন ওঠে আসে। সেখানে দেখা যায় অভাব-অনটনের ফলে দাম্পত্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। মূল্যবোধের ভাঙন দেখা দেয়। 'চিরনবীন' গল্পটি এ ধরনেরই গল্প। গল্পটি 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পে দেখা যায় মালতীর অভাব-অনটনের সংসার। বিজয়কুমারের স্বল্প উপার্জনে সংসার চালানো মালতীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে।

অভাবের তাড়নায় বিজয়কুমারের জীবনধারাতে এসেছে পরিবর্তন। সে প্রত্যহই স্ত্রীকে কটুকথা বলে। শারীরিক নির্যাতন করে। একদিন মালতীর ননদ ইলা ও তার হবু বরকে প্রত্যক্ষ করে বিজয়কুমারের মালতীকে নিয়ে পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে যায়। বিজয়কুমার নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রী-কন্যার প্রতি খারাপ ব্যবহারে লজ্জিত হয়। তেমনি 'বাঁশির সুর' গল্পেও রয়েছে, দুঃখ-দারিদ্র্য সংঘর্ষময় মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনি। গল্পটি প্রবাসী পত্রিকায়, ফাল্গুন ১৩৪১ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পটিতে দেখা যায় সুমনা ও মন্মথের সংসারে অভাবের তাড়নায় একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস সব কিছু হারিয়ে যেতে বসেছিল। পুনরায় বাঁশির সুরের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তারা।

'ননীদি' গল্পটি আশালতার দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প। এই গল্পের মধ্যে আশালতা যেমন দাম্পত্যের ছবি চিত্রিত করেছেন সেই সঙ্গে মেয়েদের আর্থিক স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গল্পটি দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পে আশালতা আটপৌরে গৃহবধূ ননীদি এবং শিক্ষিত, প্রিয়দর্শী, আর্থিক স্বাবলম্বী মীরার দাম্পত্যের ছবি এঁকেছেন। ননীদিকে প্রতিদিন গৃহকর্ম নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কলহ করতে দেখা যায়। তাঁর মতে সে স্বামীর অত্যাচারে কোনোদিনই শেষ হয়ে যেত "যদি না মুখের জোরটুকু থাকত।" অন্যদিকে মীরা অভাব-অনটনেও স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে আছে। মীরা স্বামীর সাহায্যের জন্য সারাদিনের হাঁড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পড়াতে যায়। তাঁর মতে সংসারকে সুন্দরভাবে চালাতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সহযোগিতা দরকার। কিন্তু প্রচলিত আছে—

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।"

অথচ সংসারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন— মীরার এই ধারণার মধ্যদিয়ে আশালতা দাম্পত্যজীবনের সফলতার প্রধান সূত্র ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়াও আশালতার 'মৃত্যুর আলো', 'চিরন্তন ভ্রান্তি', 'পাশের ঘর' প্রভৃতি গল্পগুলি দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প। 'মৃত্যুর আলো' গল্পে আশালতা একটি পরিবারের ছবি যেমন দেখিয়েছেন সেই সঙ্গে এটাও দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষা মনের সংকীর্ণতাকে দূর করে মনকে উদার, হিতৈষী করে তোলে। কিন্তু কখনও শিক্ষিত হয়েও তার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের অভাব দেখা যায়। কারণ সে ক্ষেত্রে শিক্ষার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতেই যে অক্ষম, অসমর্থ। যেমন দেখা যায় আলোচ্য গল্পে পরিবারের বড় বউ ইন্দু। বড় বউ ইন্দু যখন কাপড় কেনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরোবে বলে স্থির করে তখন শাশুড়ী মেজছেলের সন্তানদের জন্য নিজের পছন্দ মত কাপড় কিনে আনার কথা বললে ইন্দু মাথাব্যথার অজুহাতে সেদিন বাজারে যাওয়া বন্ধ করে। পরদিন দেখা যায় মেজছেলের মেয়ে লিলি ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লিলির মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ইন্দু নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে। বাড়ির বিভিন্ন সদস্যরা সুখে-দুঃখে একত্রে মিলে বসবাস করাকেই তো পরিবার বলে। ভালো মন্দ নিয়েই তো পরিবার। আর এসব পরিবারে বড়বৌ ইন্দুর মত সদস্যও থাকেন, মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকে যাদের সংকীর্ণ মানসিকতা, স্বার্থপরতা, নীচতার স্বরূপ।

'পাশের ঘর' গল্পে আশালতা মালতী ও কমলা এই দুই বোনের জীবনযাত্রার মধ্যদিয়ে কমলার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করান। গল্পটি 'মধুচন্দ্রিকা' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২এ প্রকাশিত হয়। কমলার বিয়ে হয় গ্রামের বনেদী পরিবারে। ১৬ বছর পর বড় ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর জন্য সে বাপের বাড়ি আসে। দুঃখ-দারিদ্র্যে, অসুখ-বিসুখে ঘেরা কমলার সংসার। তাঁর জীবনে কোথাও শান্তি, তৃপ্তি নেই অথচ তাঁর মুখে কোথাও অশান্তি বা অসন্তোষের চিহ্ন নেই। পাশের ঘরে থাকা মালতী দিদি কমলার জীবনযাত্রা ও উদার মানসিকতার পরিচয় পেয়ে তার

নিজেকে নিয়ে অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। মালতীর বাজানো এস্রাজের সুর একটু সময়ের জন্য পাশের ঘরে থাকা কমলা ও বিজয়নাথকে জীবনের সব অশান্তি ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করে। আশালতার মধ্যেকার দুটো সত্তাই ছড়িয়ে আছে দুটো চরিত্রের মধ্যে। এ ভাবনা অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের—

> *"আশালতা এই গল্পের দুই মেয়ের মধ্যে নিজেকে দুখানা করে দিয়ে নিজের পিতৃগৃহের জীবন আর পতিগৃহের জীবনের অসেতু সাধ্যতায় একটা সেতু বাঁধবার চেষ্টা করেছেন।"*[১৭]

'বড়বৌ' গল্পটিও দাম্পত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প। গল্পটি মহিলা পত্রিকায়, চৈত্র ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পে দেখা যায় একটি পরিবারের বড়বৌ অমিতা স্বামীকে চিঠি লিখে প্রেমিকের সংগে গৃহত্যাগ করে। অমিতার দাদা রজতকান্তি এই ঘটনা জানতে পেরে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে অমিতা ও তার প্রেমিক বিজনকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। অমিতার দাদা রজতকান্তি ও অমিতার স্বামী অংশুমান একই কলেজে পড়ান ও গবেষণা করেন। অংশুমান তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসলে তার মুখে বড়বৌ শব্দটি শুনে এক মুহূর্তে অমিতার মনে পড়ে যায় তার সম্পর্ক শুধু অংশুমানের সংগে নয়। সে একটা বাড়ীর বড়বৌও। তার ওপর পরিবারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে যেমন- তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো থেকে শুরু করে অনেক কিছু। এক নিমিষে মনে আসে শ্বশুরবাড়িতে নবাগত বধূ হয়ে আসা দিনগুলির কথা। অমিতা ভুল বুঝতে পেরে স্বামী অংশুমানের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করে।

একজন সাহিত্যিক কল্পিত জগত ছাড়াও বাস্তব জগতের ভালো-মন্দ উভয় দিকই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। এটাই একজন সুদক্ষ সাহিত্যিকের কর্ম। তাই আশালতার লেখনীতে দাম্পত্য বা পরিবারের এই

অধ্যায়ও বাদ পড়েনি। এই দাম্পত্য বা পরিবারকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যে বৈবাহিক জীবনে নারীদের কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় এবং দায়িত্ব কর্তব্যের টানাপোড়নে বাধ্য হয়ে নিজস্ব আশা-আকাঙক্ষাকে দূরে সরিয়ে নারী নিজেকে কিভাবে সেই পরিবেশের আদলে তৈরি করে নেয়— এসব বিভিন্ন দিক আশালতা তাঁর দাম্পত্য বা পরিবারকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। আশালতার মতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কটি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক না হয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হওয়া চাই। দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর ওপর পুরুষের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার করাকে আশালতা মেনে নিতে পারেননি বলেই দাম্পত্য বা পরিবারকেন্দ্রিক গল্পে নারীর এই দুর্ভাগ্যময় সহাবস্থানের চিত্র অংকন করে পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি। তাই আশালতার সৃষ্ট নায়িকার কণ্ঠে শোনা যায়—

"বিয়ে মানে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন নয়।"[১৮]

(৩) সমাজ-সমস্যামূলক গল্প

আশালতা সেকালের মানবজীবনের বিভিন্ন দিক যেমন গল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তেমনি সমকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা যেমন— পণপ্রথা, জাত-পাত, বেকারসমস্যা, দারিদ্র্যতা, মূল্যবোধহীনতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা তাঁর গল্পে বারবার উত্থাপন করেছেন। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারিণী আশালতা সমাজের হিতাহিত উভয়দিকই পর্যালোচনা করতে সক্ষম বলে তাঁর লেখনীতে উঠে আসা সমাজবাস্তবতা পাঠকের মনকে সত্যিই নাড়া দিয়ে যায়। 'গরমিল' গল্পটি সমাজসমস্যামূলক গল্প। সংসারে সবকিছুতেই যে গরমিল চলছে গল্পটির মধ্যদিয়ে আশালতা দেখিয়েছেন। গল্পটি 'পাঠশালা' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪০ এ

প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় সুরেশের কাকা ফিজিক্সের প্রফেসর কিন্তু সে পেটে ব্যথা সারিয়ে তোলার জন্য কবচ ধারণ করে। কবচ লাগিয়েই কলকাতায় বিজ্ঞান জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতা শুনতে যেতে চায়। ফিজিক্সের প্রফেসর হয়েও কবচের বিশ্বাসের এই গরমিলের কথা স্বীকার করে সুরেশের কাকা জগতের প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ কাজের সঙ্গে ভাবনার অসঙ্গতির বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও জাপানিরা অহিংসার নীতি মেনে চলে না। খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী ইউরোপীয়রা ঘুমন্ত শিশুর ওপর বোমাবর্ষণ করে। গল্পের শেষে দেখা যায় দেশপ্রেমিক বিশ্বম্ভরবাবুর গলায় বিলিতি ছাপ মারা মাফলার দেখতে পেয়ে সুরেশের মনে পড়ে যায় কাকাবাবুর কথা। আলোচ্য গল্পটির মধ্যদিয়ে আশালতা সমকালীন সমাজের সঙ্গতিবিহীন আচরণের ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে সুবিধাবাদী, ভণ্ড দেশপ্রেমিক বিশ্বম্ভরবাবুর মতো মুখোশধারী মানুষদেরও অনাবৃত করেছেন গল্পে।

'উৎসর্গ' গল্পে আশালতা দেখিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। গল্পটি ১৩৫০এ, 'রূপরেখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কেরানী বরেণবাবু বিপদে পড়ে ধার নেওয়া ২৫ টাকা পরিশোধ করতে না পারায় পাওনাদার প্রায়ই বাড়িতে এসে তাগদা দিয়ে যায়। অভাবের সংসারে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাড়ীতে থাকাবস্থায় ছেলেকে বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা শিখিয়ে দিতে হয়। বরেণবাবু ছেলেকে সব সময় সত্য কথা বলার উপদেশ দিতেন, সে জায়গায় তিনি নিজেই মিথ্যার আশ্রয় নেন, এই ঘটনাটি ছেলেটির মনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। ছেলেটির মনোবেদনা অনুভব করে মাকে বলতে শোনা যায়—

> *"বাবা নীরু, তুমি দুঃখ করো না। তোমার বাবা যখন তোমাকে শিখিয়েছেন 'কোন অবস্থাতেই মিথ্যে বলতে নেই তখন তিনি সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ ছিলেন। কিন্তু এখন সেই মানুষ আর নেই।"*[১৯]

আসলে অভাবজনিত কারণেই বরেণবাবুকে মিথ্যে বলতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পটির কথা। ললিত ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী বাধ্য হয়ে জাহাজের গাঁটরি লুকিয়ে বিক্রি করে ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে যায়। এখানে ললিতের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে পড়ে, 'রজনীগন্ধা' গল্পেও আশালতা দারিদ্র্যতার ছবি চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধের ফলে তৎকালীন সমাজকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। খাদ্য-বস্ত্র সবকিছুতেই দেখা দেয় হাহাকার। আশালতা মঞ্জুর সংসারের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে অভাব-অনটনের ফলে পারিবারিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ তছনছ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'মহেশ' গল্পেও তুলে ধরেছেন সেই দারিদ্র্যতার ছবি। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত গফুর ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে একদিন তার প্রাণাধিক প্রিয় মহেশ নামে গরুটিকে মেরে ফেলে। দেখা যায় খাদ্যাভাবে অন্যের জমিতে মহেশের বারবার মুখ দেওয়ার অপরাধে জমির মালিকদের কাছ থেকে গফুরকে নানা কথা শুনতে হয়। দারিদ্র্যতার শিকার হয় গফুর ও তার পুত্রতুল্য মহেশের জীবন।

আশালতার 'স্বপ্নদেখা' গল্পেও দেখা যায় আঠারো-উনিশ বছরের যুবককে পড়ার খরচ চালানোর জন্য ফেরিওয়ালাররূপে রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টি ভিজে সারাদিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিষ বিক্রি করতে যেতে হয়। অভাবের তাড়নায় তাঁকে এই ফেরিওয়ালার কাজ করতে হয়। অখিল নিয়োগীর 'সাজঘর' নাটকে সর্বদমন মঞ্চে রাজপুত্রের অভিনয় করলেও বাস্তবজীবনে সে অভাবী। সে বলে—

> *"আসল ব্যাধি আমার অভাব, সাজঘরে রাজপুত্র*
> *সাজছি কিন্তু ছেলের চিকিৎসার টাকা হাতে নেই।"*
> *(অখিল নিয়োগী, 'সাজঘর')*

আঠারো-উনিশ বছরের যুবক এবং সাজঘরে অভিনয় করা সর্বদমনের

জীবনে একটাই সমস্যা সেটা হল অভাব-অনটন। উপরোক্ত গল্প তিনটির মধ্যদিয়ে আশালতা দেখিয়েছেন সমকালীন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। এছাড়াও সমাজসচেতন আশালতাকে সমাজকেন্দ্রিক নানা অসঙ্গতি, বৈষম্য, অব্যবস্থা ভাবিয়েছে বলে তাঁর গল্পে পণপ্রথা এবং পাত্রীনির্বাচনের নামে মেয়েদের সে অপদস্থ হতে হয় এমন বিষয়, যেমন— 'কনে দেখা', 'নারীর মূল্য', 'বদলে', 'কালোমেয়ে', 'প্রশ্ন পত্র' ইত্যাদি গল্পে ওঠে এসেছে। দীর্ঘকাল থেকে সমাজে নানা ধরনের জঘন্য প্রথা চলে আসছে। পণপ্রথা এর মধ্যে একটি। বরপক্ষের চাহিদার আগুনে বাংলাদেশের অসংখ্য মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে, পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। আশালতার 'বদলে' গল্পে দেখা যায় রেখা পাত্রপক্ষের বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে না পারায় পাত্রীর খুঁতগুলো ঢাকতে পাত্রপক্ষ পণের অংকটা বাড়িয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনা পাওনা' গল্পটির কথা। দরিদ্র রামসুন্দর মিত্রের একমাত্র মেয়ে নিরুপমা। তাঁর শ্বশুর 'দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দান সামগ্রী চাহিয়া' বসে। এমন কি পাত্রের পিতা রায়বাহাদুর স্পষ্ট জানিয়ে দেন—

> *"টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"*[২০]

পণের অংকটা পুরো দিতে না পারায় বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিবাহ পুরোনো সামাজিক প্রথা। আর এই প্রথার অঙ্গ পাত্রী নির্বাচন। এই নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে নারীকে যে অপদস্থ হতে হয় তা সমাজসচেতন আশালতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই 'কনে দেখা', 'প্রশ্নপত্র' প্রভৃতি গল্পে এই বিষয়টি তুলে ধরে পাঠক মহলকে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কনে দেখা আলো' গল্পে সুকুমারকে পাত্রী দেখতে যেতে হয় প্রতিবেশী দিব্যেন্দুর একান্ত অনুরোধে। পাত্রীর বাড়ি পৌঁছানোর পথে বিবাহ ও বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার-রীতিনীতি সম্পর্কে সুকুমার ভাবে—

"সত্যি, কী নৃশংসতা। দেশটা এত বদলালো, কিন্তু এ জিনিসটা যেমন ছিল বয়ে গেল তেমনিই। চুল মেপে হয়তো আজকাল আর দেখা হয় না, 'উঁচু কপালী চিরুণদাঁতী' কিনা তাও হয়তো দেখা হয় না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; কিন্তু নির্লজ্জ নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে রূপ যাচাই করে নেওয়া হয়, অন্তত দেড়খানা রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়, অকারণ আর অর্থহীন সাহিত্য চর্চার চেষ্টা করতে হয় খানিকটা, এমব্রয়ড্রারী থেকে শুরু করে মাছের আঁশের কাজ আর শ্রীনিকেতন— মার্কা চামড়ার কাজ এসে জড়ো হয় স্তূপাকারে। সমস্ত প্রক্রিয়াটার মধ্যে যেন একটা বর্বরযুগীয় প্রথা—"[২১]

সুকুমারের এই ভাবনার মধ্যে লেখক পাত্রীনির্বাচন নামে যে বর্বর প্রথা যুগ-যুগ ধরে বাংলাদেশে চলে আসছে, যার ফলে মেয়েদের যে অবমাননার শিকার হতে হয় সে বিষয়ে পাঠক মহলকে সচেতন করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্যকেও গল্পের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন আশালতা।

এছাড়াও আশালতা মূল্যবোধহীনতার মতো সামাজিক সমস্যাও উত্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম' গল্পে স্বার্থপরতা মূল্যবোধহীনতার প্রকাশ ঘটে সুপ্রভার মধ্য দিয়ে। যা তৎকালীন সমাজের বড় সমস্যারূপে পরিগণিত। গল্পে দেখা যায় সুপ্রভা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অহংকারী, স্বার্থান্বেষী মহিলা। সে স্বামী ও পরিবারের সংগ থেকেও সভা-সমিতিতে সময় অতিবাহিত করতে ভালোবাসে। স্বামীর ভালোবাসা, বিশ্বাসের থেকে অত্যন্ত প্রিয় তার কাছে আপন ব্যক্তিত্ব, অধিকার, স্বাধীনতা। সুপ্রভার অহংকার, ঔদ্ধত্যের জন্য সুবিমলের সংগে তার দাম্পত্যজীবনে দেখা দেয় অশান্তি। তৎকালীন সমাজের এসব বিভিন্ন সমস্যার

উপর আলোকপাত করেছেন আশালতা তাঁর বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে। এতে তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচয় যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট তৎকালীন পরিসরে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানের স্বরূপ।

(৪) নারীকেন্দ্রিক গল্প

পুরুষপ্রধান সমাজে নারী কোনো না কোনো ভাবে পুরুষের হাতে শোষিত, নির্যাতিত। কখনও নিয়মনীতির নামে কখনও বা ধর্মের দোহাই দিয়ে চলে নারীকে অন্তঃপুরে নিরন্তর আটকে রাখার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। নারীর ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছুরই নির্ণায়ক পুরুষ।

'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে জননী অর্থাৎ নারীজাতিকে ভারতবর্ষে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হলেও বাস্তব চিত্র হল পুরুষশাসিত সমাজে নারী অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। আশালতা তাঁর 'মেয়েমানুষ' গল্পে মা, মেয়ের সম্পর্কের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন নারী বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাঁদের অবস্থান এক। পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে অবহেলার চোখে দেখে। কারণ সে যে মেয়েমানুষ। নবপরিণীতা ললিতা শ্বশুরালয়ে এসে শুনেছে শ্বশুর, শাশুড়ীকে বলছেন—

> *"তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক, তোমার এসব কথায় থাকবার দরকার কি? আর বোঝই বা তুমি কি?"* [২২]

ঠিক তেমনি নন্দাই এর কণ্ঠে ননদের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব শুনতে পায় ললিতা। শৈলবালার 'অরু' উপন্যাসে দেখা যায় অরুর নিষ্ঠুর, অত্যাচারী স্বামী প্রতাপচন্দ্রের মুখেও একই ধরনের কথা—

"চোপ! মেয়েমানুষ তুমি, মেয়েমানুষের মতো চুপ করে থাকো।"[২৩]

পুরুষপ্রধান সমাজে চিরকালই নারী অবহেলিত। নারীর পিতৃগৃহ বা পতিগৃহ কোনো গৃহেই আপন মতামত প্রকাশের অধিকার নেই। 'মেয়েমানুষ' গল্পে আশালতা মা, মেয়ের মধ্যদিয়ে সুন্দরভাবে নারীর এই সামাজিক অবস্থান দেখিয়েছেন। রোকেয়াও বলেছেন—

"... অধিকাংশ ভারতনারী গৃহ সুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে। অভিভাবকের বাটীতে আপন ভবন মনে করিতে অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়।"[২৪]

পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের জীবনের একমাত্র মানে বিয়ে। আর এই বিয়ের পাত্র ষাট বা আশি বছরের বৃদ্ধও হতে পারে। মূলত বিয়ে হওয়াটাই মুখ্য বিষয়। 'মেয়েমানুষ' গল্পে আশালতা সমাজের এই কদর্য মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় করান। গল্পে দেখা যায় ১৫ বছরের আনুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় ৫০ এর কাছাকাছি পাত্রের। আনুর বিয়েতে ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত অভিভাবকরা। কিন্তু কখনো এ বিষয় নিয়ে কোনো অনুশোচনাও অভিভাবকদের করতে দেখা যায় না বরং শোনা যায় এ ধরনের কথা—

"তা বেশ হয়েছে আনুর মা। বেটা ছেলের আবার বয়স কি। এতদিন পরে যে আনুর বিয়ের ফুল ফুটল সেই সর্বরক্ষে।" [২৫]

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা'র মৃত্যুপথযাত্রী সেই বুড়োর কথা। মৃত্যুর কোলে যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় যশোমতীর। প্রবাদই তো আছে "বৃদ্ধস্য তরুণী

ভার্যা"। পিতামাতারা কখনও নিরুপায় হয়ে এক ঘরে হবার ভয়ে আবার কখনও জন্মজন্মান্তরের পুণ্যলাভের আশাতেও কন্যাদের অধিক বয়সের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েদের ভূত-ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেন। আশালতা আনুর মধ্যদিয়ে এমন শত-শত মেয়েদের জীবন কাহিনীকে তুলে ধরেছেন যাঁরা আনুর মতো এমন পরিস্থিতির শিকার।

'নারীর মূল্য' গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আবার অন্য মানসিকতায় অভিভাবকদের দেখা যায় যারা অন্যদের চাইতে একটু ব্যতিক্রম। যে কোনো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে তাদের আপত্তি। তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করার পেছনে মূল কারণ হল পাত্রলোভ। মূলত তাদের কাছেও মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটাই মুখ্য বিষয়। মেয়েদের পড়াশোনা শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা গৌণ, মুখ্য বিষয় হল বিয়ে। তাই হয়তো শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'র নায়িকা বলেছে—

> *"মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"*

পুরুষপ্রধান সমাজে পুত্রই একমাত্র কাম্য। পুত্রের আগমনে বাড়িসুদ্ধ সকলেই আনন্দে আত্মহারা। যদি কোন স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হয় তবে শ্বশুরালয়ের একান্ত ইচ্ছায় একাধিকবার গর্ভধারণ করতে হয়। 'নারীর মূল্য' গল্পে নীরজাকেও ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। নীরজার পুত্র সন্তান জন্ম হলে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই আনন্দে আত্মহারা। পাশের বাড়ির গৃহিণী তার স্বামীকে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেকালের সমাজে নারীর অবস্থানের কথা তুলে ধরেন—

> *"বাঙালী ঘরে ছেলে-মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশ-*

পাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন-ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে যদি দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে করিবেন অপরাধী, পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না।"[২৬]

নারীর দুটি আশ্রয় প্রথমত : পিত্রালয়, দ্বিতীয়ত : শ্বশুরালয়। পিত্রালয়ে পিতা-মাতার সস্নেহ ও শাসনে নারী বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে শ্বশুরালয়ে নারীজীবন দৈনন্দিন হাজার নিয়মনীতির শাসনে আবদ্ধ। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের নির্ণায়ক স্বামী। স্বামী নিজের মনের মতো স্ত্রীকে নির্মাণ করার ফলে নারী হারিয়ে ফেলে তার নিজস্বতা। আশালতা 'উমার তপস্যা' (উত্তরা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭০) গল্পের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে স্বামী স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেয় নিজস্ব ইচ্ছা ও পছন্দকে। স্ত্রী অমিতা টলস্টয়ের "অ্যান্যা ক্যারেনিনা' পড়তে পছন্দ করা সত্ত্বেও স্বামী সমরেশের কড়া নির্দেশ যাতে সে এসব বই কখনও না পড়ে। সমরেশকে বলতে শোনা যায়—

"দেখ এখন থেকে সাবধান করে দিছি, এসব বই তোমার পড়া চলবে না, ... কখনো ভুলো না যেন বিপদ হবে তাহলে।"[২৭]

দাম্পত্যে অনেক সময়ই নারী চালিত হয় স্বামী বা শ্বশুরালয়ের সদস্যদের একান্ত ইচ্ছায়। আশালতার 'মা' গল্পে দেখা যায় অরুণাও শাশুড়ীর অপছন্দের জন্য গানে উৎসাহ দেখাতে পারেনি। ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন লেখিকা আশালতাও।

হেঁসেলের হাড়িকুড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকে মেয়েদের জীবন। মেয়েদের এই স্থিতিশীল জীবনের বাস্তবরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'রান্নাঘর', 'দাবি', 'স্বপ্নের অর্থ' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে। 'রান্নাঘর' গল্পের সুধীরার মতো প্রায় মেয়েদের জীবনই 'রাধার পর খাওয়া' 'আর খাওয়ার পর রাধা' এই আবর্তনের মধ্যদিয়ে কাটতে থাকে। 'দাবি' গল্পেও দেখা যায় শিক্ষিত মঞ্জুলার জীবনেও উদয়াস্ত রান্না ও রোগীর সেবা তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর নিজস্ব আশা-আকাঙক্ষা সাংসারিক চাপে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসী ঘর-সংসারের কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। বলেছেন—

> *"আমি গোপনে-গোপনে কাজ করিয়া রাখিতাম, তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন।"* [২৮]

যে নারী নির্বাক ভূমিকায় নিরন্তর গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে তথা যে 'নির্বাক', 'জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ, সেকালের সমাজের কাছে সেই আদর্শ গৃহিণী। সেই-ই সোহাগের পাত্রী। নিরন্তর গৃহস্থালির সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার যোগ্যতা ছাড়া সেকালের পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে অন্য কোনো ভূমিকায় দেখতে অনিচ্ছুক। মূলত সংসারে নারী ব্যবহৃত হয়েছেন দাসী হিসেবে। স্বামীগৃহে নারীকে দাসী করে রাখার বিধান তো দিয়েছেন মনুই—

> *"স্বামী ও স্বজনগন স্ত্রীলোকদের দিবরাত্রির মধ্যে কখনো স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না, কাজে ব্যস্ত রেখে সব সময় তাদের নিজেদের বশে রাখবেন।"* [২৯]

পুরুষশাসিত সমাজে নারী সম্পর্কিত যে প্রচলিত ধারণা ছিল সেগুলো আশালতার বদল ঘটাতে চেয়েছেন। তাই পুরোনো প্রচলিত সংস্কার, রীতিনীতির

বাঁধনকে যেমন তিনি ছিন্ন করতে চেয়েছেন তেমনি পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারকে না মেনে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর লেখনীতে এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে প্রয়াত কবি মল্লিকা সেনগুপ্তও একুশ শতকে তাঁর কবিতার মধ্যদিয়ে ঘোষণা করেছেন নারীপুরুষের সমানাধিকারের কথা—

"পৃথিবীটা এতদিন পুরুষের ছিল
তোমাকে দিলাম আজ তার আধখানা—"[৩০]

(৫) মনস্তত্ত্বমূলক গল্প

আশালতা মানব মনের লুক্কায়িত নানা ভাবনা, রহস্য, জটিলতা প্রভৃতি অত্যন্ত নিপুণহস্তে চিত্রিত করেছেন তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পের মধ্যদিয়ে। এসব গল্পগুলিকে মনস্তত্ত্বমূলক গল্প নামে অভিহিত করা যায়। পাঠকদের যা ভাবনার অতীত সে বিষয়গুলোকে অত্যন্ত কৌশলসহকারে চিত্রিত করেন আশালতা তার গল্পে। আশালতার কয়েকটি গল্পে উঠে এসেছে নারী মনস্তত্ত্ব। এই নারীমনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মধ্যে রয়েছে 'নারীচরিত্র', 'পটপরিবর্তন', 'ক্ষণকাল', 'নতুনরেশ', 'অর্ন্তদ্ধান', 'প্রেমেররূপ', 'কাব্যমণ্ডল' প্রভৃতি।

'নারীচরিত্র' গল্পটি ৫টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। 'উদয়ন' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪১ এ প্রকাশিত হয় গল্পটি। গল্পটিতে আশালতা নারীর মনোলোকে লুক্কায়িত রহস্যের উদঘাটন করেন। দেখা যায় সুন্দরী, শিক্ষিতা মাধবী ইন্দিরার দেওরের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শুধু পিতা ও ছোটবোনদের দেখাশোনার জন্য। কিন্তু এক সময় দেখা যায় মধ্যবয়স্ক ম্যাজিস্ট্রেটকে ভালোবেসে সে বিয়ে করতে চায়। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তার কোনদিকেই মিল নেই। অথচ তাঁর জন্য সে সব কিছু করতে প্রস্তুত। মন থেকে কাউকে ভালোবাসলে যে রূপ, গুণ, যোগ্যতার বিশেষ ভূমিকা থাকেনা, আশালতা নারী মনের এই রহস্যই উদ্‌ঘাটন

করেছেন আলোচ্য গল্পে। 'পটপরিবর্তন' গল্পে দেখা যায় বালিকাবধূর সাংসারিক জীবনের চিত্র। যে বধূটি পাঁচ বছর পূর্বে স্বামী ও শাশুড়ীর নির্যাতন সহ্য করে সেই-ই পাঁচ বছর পর স্বামীটিকে পুতুলে পরিণত করে। শাশুড়ী অসুস্থ হলে সে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। প্রতিশোধপরায়না নারী অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয় করায়-গণ্ডায়। আশালতা নারী মনের এই রহস্যময় দিক সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করান আলোচ্য গল্পে।

'নতুন রেশ' গল্পটিতে আশালতা বেলা ও সুলতার মনোলোকের ছবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এঁকেছেন। গল্পটি 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪০এ প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস ফাণ্ডে দানের উদ্দেশ্যে সুলতার কথায় চ্যারিটিতে পারফারমেন্স করার জন্য বেলাকে কলকাতায় যেতে হয়। বেলা দেখে বিবাহিতা বান্ধবী সুলতার ডাক্তার স্বামী নেপালে থাকে আর সে এদিকে অন্য আরেকটি ছেলেকে ভালোবেসে তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। বেলার এসব দেখে রাগ হয়। মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হঠাৎ বেলাকে অভিনয়ের আগেই বাড়ি ফিরতে হয়। দ্বিরাচারী সুলতার আগামী দিনের আচরণ নিয়ে সে চিন্তিত হয়। ভাবনার রাজ্যে একের পর এক প্রশ্ন উঠে আসে।

'অভিমান' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অন্তর্দ্ধান' গল্পটিও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। গল্পটি সাত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পটিতে আশালতা অসিতার মধ্যদিয়ে নারীর ঈর্ষাজনিত মনোভাবকে যেমন দেখিয়েছেন সেই সঙ্গে অজিতের মনস্তত্ত্বের জটিলতাকেও উত্থাপিত করেছেন। আধুনিক লেখক অজিতের সঙ্গে অসিতার পত্রালাপের মধ্যদিয়ে গল্পটির শুরু হয়। পত্রের মাধ্যমেই অজিতের নতুন রচনা নিয়ে নানা চর্চা হয় অসিতার সঙ্গে। একদিন বইয়ের মধ্যে অসিতার বোন অমিতার ফোটো ভুলবশত চলে যাওয়ায় অমিতাকে অসিতা ভেবে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে অজিত। কলকাতায় অসিতার নতুন বাড়িতে অজিত নিমন্ত্রিত হয়ে এসে যখন তার ভুল ভাঙে তখন রূপহীন অসিতাকে দেখে সে কিছুতেই তাকে মন থেকে

গ্রহণ করতে পারেনি। অজিত ভালোবেসেছিল সৌন্দর্যকে। তার কাছে মূল্যহীন রূপহীন অসিতা। আশালতা অজিতের মধ্যদিয়ে তার মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে উত্থাপিত করেছেন। অন্যদিকে অসিতা যখন দেখে অজিতকে বোন অমিতার সঙ্গে তখন নারীজনোচিত ঈর্ষার ভাবটি তার মধ্যে ফুটে ওঠে।

'পরিবর্ত্তন' গল্পটিকেও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প বলা যায়। গল্পে কমলার মানসিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় বান্ধবী কালীতারার বাড়ী থেকে আসার পর। আশালতা আলোচ্য গল্পের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন মানুষ একে অন্যের থেকে দেখে শিখে। যাকে বলে 'দেখাদেখি শিক্ষা'। কমলা কালীতারার পতিভক্তি, সন্তানবাৎসল্য, ঘর সুন্দর সাজিয়ে রাখা, সকলের সেবায় নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেও তার মুখে কোথাও ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই, সর্বদাই আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, এছাড়া ডাক্তার স্বামী রোগী দেখতে গিয়ে না ফেরার পরও সে অভুক্ত আছে। এসব দেখে কমলার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। স্বামী রাত এগারোটায় ক্লাব থেকে ফিরে এসে দেখতেন টেবিলে খাবার ঢাকা থাকত যা চাকর দাঁড়িয়ে খাওয়াতো। এখন স্বামী যত রাত অবধি না ফেরেন কমলা বই পড়ে, স্বামীকে দেখামাত্র স্টোভ ধরিয়ে গরম লুচি করে দেয়।

'কাব্যমণ্ডল' গল্পে ধীরার মানসিক পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আশালতা। গল্পটি 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পে দেখা যায় স্বামী হরসুন্দরের সঙ্গে ধীরা দাম্পত্যজীবন সুন্দরভাবেই অতিবাহিত করছিল। একদিন ডাকযোগে বোন নীরার স্বামী অবনীশবাবুর কবিতা এলে ধীরার মনোজগতে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। সে তার স্বামীর মধ্যে নানা দোষ খুঁজতে থাকে যেমন— ঘুমানোর সময় নাকের শব্দ, তেল মাখবার সময় আট হাত কাপড় পরা ইত্যাদি। ধীরে-ধীরে ধীরার সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। ধীরা শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে আবহাওয়া বদলের জন্য স্বামী হরসুন্দর তাকে বোন নীরার বাড়ীতে রেখে আসেন। সেখানে ধীরা দেখে নীরার স্বামী অবনীশের

সঙ্গে প্রত্যেকদিনই সাংসারিক ছোট-ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। তাদের আচার-আচরণে ও গৃহের পরিবেশে ধীরা কিছুদিনেই হাপিয়ে ওঠে। ধীরা আশা করেছিল কাব্যিক পরিবেশে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখানে এসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। সে স্বামীর কাছে ফিরে যায়।

'মনস্তত্ত্ব' গল্পে উঠে আসে ব্যক্তিমননের ছবি। সে কাগজের সম্পাদক, চরিত্রটির নাম নেই। তিনি রক্ষণশীল মনের অধিকারী। নারীদের ঘরকন্না প্রধান কাজ বলে মনে করেন তিনি। মেয়েদের পড়াশুনাকে গুরুত্ব দেন না। তাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে সদ্য আসা ভাড়াটে পরিবারের কথাবার্তা শুনে তিনি মেয়েকে স্কুলে দেন। কিন্তু পূর্বের মতনই রক্ষণশীল মানসিকতার প্রতিফলন থেকে যায় তার লেখনীতে। বাহ্যিক দিক দিয়ে আধুনিকতাকে গ্রহণ করলেও অপরিবর্তিত থেকে যায় তার মনোজগত।

'বান্ধবী' গল্পে আশালতা সুজিতের মতো ভণ্ড, চতুর, পুরুষদের মানসিকতাকে উপস্থাপন করেছেন যারা আপন স্বার্থে মেয়েদের ব্যবহার করে। গল্পে দেখা যায় মালতী আধুনিকা, শিক্ষিতা, প্রগতিশীল নারী। সে সভা-সমিতি করে। কোরক দাস, সুজিত চক্রবর্তী তার বন্ধু। সুজিতের সঙ্গে মালতীর মেলামেশাকে মালতীর বাবা ভাবেন হয়তো তারা একে অন্যকে ভালোবাসে। মালতীর বাবা সুজিতের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে সুজিতকে বলতে শোনা যায় মালতীকে নিয়ে সে একদিন স্বপ্ন দেখলেও 'শেষের কবিতা' পড়ার পর বান্ধবী হিসেবে মালতীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সে মালতীকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে।

কখনও এমন হয় আমাদের মনের ভাবনাকে অন্যের সামনে ব্যক্ত করতে আমরা সংকোচ, লজ্জা অনুভব করি। তখন অন্য কাউকে আশ্রয় করে বা গানকে মাধ্যম করে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। 'সুরের মায়া'

গল্পে তেমনি দেখা যায়। মালতী ও কমলের মনে গান ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। তেমনি তাদের কন্যা অশোকা ও তার প্রণয়ী অজিতের মধ্যে থাকা সকল সঙ্কোচ ও ব্যবধানের বাধা ডিঙিয়ে তাদের ভালোবাসা দাম্পত্যে পৌঁছে। গান মানব মনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। যার মাধ্যমে মালতীও কমলের বা অশোকা ও অজিতের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। 'সুরের মায়া' গল্পটিকেও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'সময় হয়েছে' গল্পটিও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। গল্পটি ১৯৩৪ সালে বিহারে হওয়া ভূমিকম্পের কবলে আসা হাজার-হাজার মানুষের অসহায়-নিরুপায় অবস্থা, তাদের সমস্যা দেখে আশালতা লিখতে উৎসাহী হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমাজে যে বিভিন্ন সমস্যার উদ্‌ঘাটন করতে পারে তাই-ই গল্পে তুলে ধরেছেন আশালতা। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন অজিতের নিঃস্বার্থ পরোপকারে এগিয়ে আসা দেখে নরেনের মনের পরিবর্তন ঘটে। সেও এগিয়ে আসে ত্রাণকার্যে। গল্পটি মাঘ ১৩৪৪ এ 'পাঠশালা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পে দেখা যায় নরেন মাতৃহারা। ছোটবেলা থেকেই কাকিমার আশ্রয়ে বড় হয়েছে। সে বইপড়া ছাড়া অন্য কিছু করতে জানে না। অন্যদিকে কাকিমার ছেলে অজিত সকল কাজে পারদর্শী। সে মানবদরদী মানুষ। উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের ফলে চতুর্দিকে যখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখা দেয় তখন অজিত তার স্কাউটবয়দের নিয়ে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্র ধরণীর জনগন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে চলেছে তখন অজিতের এই নিঃস্বার্থ পরোপকারে এগিয়ে আসা দেখে নরেনের মনের পরিবর্তন ঘটে। তাই নরেনের অজিতকে বলতে শোনা যায়—

> *"পুঁথি পড়ার বোঝা ফেলে রেখে, ঠিক তোমারই মত, দুঃখীর দুঃখে, বাস্তব জীবনের সকল প্রয়োজনে সাড়া দিতে সক্ষম করে তুমি আমায় গড়ে নাও।"*[৩১]

আশালতার আরও বেশ কয়েকটি গল্পে যেমন— 'পত্রপরিচিতা', 'আবির্ভাব', 'বিরহ', 'সেলায়ের কল' প্রভৃতি গল্পেও নর-নারীর মনোজগতের চিন্তাভাবনা, রহস্য ও জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে।

এছাড়াও আশালতার গল্পে বিষয় রূপে উঠে আসে শহর ও পল্লী গ্রাম। আশালতা শহর ও গ্রামে বসবাস করার জন্য সেসব জায়গার মানুষদের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে ব্যক্তিজীবনে পাওয়া নানা অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে। আশালতার গল্পে শহর ও গ্রামের ঘটনা জায়গা করে নিয়েছে। শহুরে মানুষদের মনে গ্রাম সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তিমূলক ধারণা দানা বেঁধে থাকে। আশালতার গল্পে সে সব ধারণা খণ্ডন হতে দেখা যায়। 'ভালোলাগা' গল্পে শহর ও গ্রামের ঘটনা রয়েছে। গ্রামের ছেলে সুধাংশু আপন প্রতিভাগুণে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেয়। দেশে ফিরে শহরের শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে ছায়াকে বিয়ে করে। ছায়ার গ্রামকে নিয়ে যে ভুল ধারণা ছিল তা বোঝা যায় তার কথায়—

> *"তোমাদের সেই পচা পড়াগাঁয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতন আবদ্ধ জীবন, আর বনগাঁয়ের বুনোবাবু হয়ে থেকে কতকগুলো অশিক্ষিত দেওয়ান আর গোমস্তার উপর সর্দ্দারি করে বেড়ানো, বলি ছাড়ার বহরটা এই ত?"*[৩২]

সে ধারণা যে নিতান্ত ভুল কিছুদিন গ্রামের স্বচ্ছন্দ বাতাবরণে বসবাসের পর এবং ছোটোজার অকৃত্রিম সেবা, আন্তরিকতা ও সহানুভূতির স্পর্শে সে বুঝতে পারে। গ্রাম তো উন্মুক্ততার প্রতীক। যেখানে নেই কোনো সংকীর্ণতা। একে অন্যের সুখে-দুঃখে সকলে থাকে। আশালতার এই গল্পটি পল্লীগ্রামের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসার পরিচায়ক।

'সংকল্প' গল্পটিও শহর ও পল্লী-গ্রামকেন্দ্রিক গল্প। গল্পটি 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখা যায় গল্পটিতে নায়কের পিতা নায়কের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করে তাকে এম.এ. পর্যন্ত পড়ান। সে সব সময়ই প্রথম স্থান অধিকার করে। তার গৌরবে পাড়াগাঁয়ের সকলেই গৌরবান্বিত। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়ায় গ্রামের জমিতে চাষ করতে ইচ্ছে হয় তার।

গল্পের শেষে দেখা যায় চাকুরীর নিয়োগপত্র পাওয়ায় সে গ্রামে চাষ করার সংকল্প থেকে সরে আসে। আশালতা নায়ক চরিত্রটির মধ্যদিয়ে সুবিধাবাদী মনোভাব তুলে ধরেছেন। কোথাও কোনো উপার্জনের রাস্তা না পেয়ে একান্ত অনিচ্ছায় গ্রামে ফিরে আসে। তার জন্মস্থানের প্রতি কোথাও কোনো মায়া বা টান নেই। চাকরি পাওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'নীর ও ক্ষীর' গল্পে আশালতা শহরের জীবন ছাড়াও গ্রামবাংলার সংস্কৃতি— সৌন্দর্যের পাশাপাশি গ্রামের দুঃখ, বেদনা, কুশ্রীতা সবকিছুই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। গল্পে দেখা যায় মণিকা ও তাঁর সাহিত্যিক স্বামী এবং অন্যান্য সাহিত্যিকেরা সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামে আসেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর শহর থেকে আগত সাহিত্যিকেরা গ্রামের সৌন্দর্য দেখার অভিলাষে যখন পথ দিয়ে বেরিয়েছেন তখন সাঁওতাল পাড়ায় এসে দেখলেন সাঁওতালরা মাদল বাজিয়ে নেচে যাচ্ছে। চাঁপাকলির পত্রিকায় ভূধরবাবু সাঁওতাল নৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা করার কথাও বলেন। সাঁওতাল পাড়ার মদের গন্ধে তাদের অসহ্য ঠেকে। এ অবস্থায় ভূধরবাবু মন্তব্য করেন— "নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করুন।"

কিন্তু মণিকা ভাবে—

> *"এই যে পাড়াগাঁয়ে আসা— এত হৈচৈ করা এ সমস্তই কি নিরর্থক নয়— যদি না ভালো-মন্দ, সুখ-*

দুঃখ সমেত ইহার সবটাকেই গ্রহণ করিতে পারি।"[৩৩]

গল্পটির মধ্যদিয়ে আশালতা দেখিয়েছেন একটি স্থান বা জায়গায় ভালো-মন্দ দুটিই দিক থাকে। তবে সুখ-দুঃখ, কুশ্রীতা, ভালো-মন্দ সব কিছু গ্রহণ করে তাকে ভালোবাসতে হবে। এখানে আশালতার নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

আশালতার 'নবযুগ' গল্পে সমাজবাস্তবতার ছবি ফুটে ওঠে। কিভাবে শহরে থাকা শিক্ষিত ধনী লোকেরা ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে সহজ, সরল গ্রামবাসীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপন স্বার্থে ক্রমাগত তাদের ব্যবহার করে যায় আলোচ্য গল্পে আশালতা তাই-ই তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত গ্রামবাংলার জনসাধারণকে ঠকিয়ে যায় সুবিধাবাদী ব্যক্তিরা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়ার কথা। সে গ্রামের জনগনের অভাবের সুযোগ নিয়ে জনজীবন বসবাস অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপে তাদেরকে ভালো থাকার স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে যায় তাদের। 'নবযুগ' গল্পে ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থীরা অজ্ঞ, দরিদ্র পল্লীবাসীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে ভোট আদায় করে নেয়। তারা জানে গ্রামবাসীর প্রধান প্রয়োজন খাদ্য। সেই খাওয়া-দাওয়াকেই মাধ্যম করে তাঁরা আপন স্বার্থ আদায় করে। দেখা যায় যে ভালো খাওয়ায় তাঁকে সমর্থন করে গ্রামবাসীরা।

'তৃষ্ণা' গল্পে আশালতা শহর ও গ্রামের মেয়েদের জীবনযাত্রার তফাত এবং সেকালের গ্রামীণ সংস্কারগুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উদঘাটিত করেছেন। গল্পটি 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৪৮ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় দিদি সুভাষিণী স্বামী-সন্তান সহকারে ছোটবোন সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে আসে। সংরক্ষণশীল সমাজের রীতিনীতি স্বামী ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের মধ্যে লালন করে

চলেছেন। বিয়ের আগে সুনীতি স্বামীর সঙ্গে কেনাকাটায় যাওয়া ছাড়া বাড়ির কূলবধূদের জানালায় দাঁড়িয়ে স্বদেশী দেখা বনেদি ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিকটু মনে হয়। পুরোনো মানসিকতার বাহক ত্রৈলোক্যনাথকে সুভাষিনীর পিত্রালয় সম্পর্কে কুকথা বলতে শোনা যায়—

> *"ওরা সব গেরস্ত ঘরের কূলবধূ না কি? ওরা যে কি, তা আর বলবো না। কিন্তু খবরদার বলছি, আর যেন আমাকে সাবধান ক'রে দিতে না হয়। সামলে চ'ল।"*[৩৪]

ভগ্নীপতি সুবোধের সুনীতির প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি দেখে সুভাষিনীরও স্বামীর কাছ থেকে তেমনি ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকাঙক্ষা জাগে।

উপরোক্ত গল্পগুলির আলোকে আশালতা শহর ও পল্লীর ভালো-মন্দ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলেন। শহর ও পল্লীগ্রামকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যদিয়ে আশালতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন কিভাবে শহরের সুবিধাবাদী ব্যক্তিরা গ্রামবাংলার সহজ সরল মানুষদের কিভাবে প্রতারিত করে, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। অন্যদিকে দেখা যায় গ্রাম সম্পর্কে শহুরের মানুষদের ভ্রান্ত ধারণার চিত্র তুলে ধরেছেন আশালতা তাঁর গল্পে। গ্রামবিহীন শহরের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি শহরবিহীন গ্রামেরও। বলা যেতে পারে গ্রাম ও শহর একে অন্যের পরিপূরক৷ আশালতা এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলেই শহর ও গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন চেয়েছেন।

আশালতার গল্পে প্রেম, দাম্পত্য, তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান এমন বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার ছবিও ওঠে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। চারিদিকে মূল্যবোধের

ভাঙন, এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। সেই বিপর্যস্ত সময়ের শিকার হয় তৎকালীন সমাজ। আশালতার 'বিয়ের পর' গল্পে এই বিষয় উঠে এসেছে।

অরুণা ও বরুণা দুই বান্ধবীর বিয়ের আগে দু'জনের মতপার্থক্য থাকলেও বিয়ের পর কাপড়ের অভাব, চালের অভাব, কয়লার অভাব তাদের দুজনের আদর্শবাদকে এক করে দেয়। যুদ্ধের আকালে চারিদিকে অন্ন, বস্ত্র, কেরোসিনের সংকট দেখা দেয়। এরফলে মানবজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আলোচ্য গল্পে সুনিপুণভাবে আশালতা এই অস্বস্তিকর পরিবেশের জীবন্ত বর্ণনা করেছেন। অন্ন-বস্ত্র-কেরোসিনের সংকটে চারিদিকে যে বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩) আছে—

> *"... কেরোসিন তেলের অভাব এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রায় শতকরা ৯০ জনের ঘরে সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে না, অথচ স্বার্থপরায়ণ লোকেরা সহযোগিতায় মহাজনেরা গোপনে বেশি দামে এদিকে ওদিকে তেল চালান দিতেছে। ..."*[৩৫]

এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতি সেকালের লেখকবর্গের হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। তাই এসব ভয়াবহ ঘটনার অনবদ্য ছবি যেমন ওঠে আসে আশালতার লেখনীতে তেমনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরোসিন', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' প্রভৃতি গল্পে।

'স্বপ্নে দেখা' গল্পে সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব ছবি দেখা যায়। গল্পে দেখা যায় কয়েকজন বন্ধুরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। সে সময় আসে আঠারো-উনিশ বছরের এক যুবক। যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার

জন্য পড়ার খরচ চালাতে না পেরে ফেরিওয়ালার কাজে নেমে পড়েছিল। গল্পের শেষে দেখা যায়, ছেলেটি সারাদিনের হাঁড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে যায়। সেখানে গল্পের কথক ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে মনে হয়—

> *"জীবনে যার আলো নেই, আশা নেই, স্বপ্ন নাই,*
> *আদর্শ নাই, সে অন্ততঃ চার আনা পয়সা খরচ*
> *করিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্ন দেখিতে পারে।"*[৩৬]

অভাব-অনটনের জন্য ছেলেটির মন থেকে হারিয়ে যায় আনন্দ। ক্রমাগত সে রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টি ভিজে পেটের দায়ে ফেরিওয়ালার কাজ করে চলে। বায়োস্কোপ দেখে সে একটু সময়ের জন্য হলেও জীবনের সব দুঃখ ভুলে আনন্দকে উপভোগ করতে চায়।

আশালতার গল্প পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তাঁর গল্পে অধিক মাত্রায় যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল— প্রথমতঃ আশালতা পুরুষ অপেক্ষা নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আশালতা গল্পের বয়ানে ব্যবহার করেছেন বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি, অনুষঙ্গ। পিতা যতীন্দ্রমোহনের ভাগলপুর ইনস্টিটিউট নামের লাইব্রেরী থেকে এনে দেওয়া অসংখ্য বাংলা ও ইংরেজী বই এবং মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়াকালীন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের পাঠদান আশালতাকে এসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে সহায়তা করে। পরবর্তী সময়ে আশালতা এই অভিজ্ঞতা দিয়েই সাজিয়ে তোলেন তাঁর রচনাসম্ভার। এ বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে— 'নিরুপম', 'অন্তর্দ্ধান', 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল', 'আশঙ্কা', 'উমার তপস্যা', 'বেদনার বিভিন্নতা', 'বড়বৌ', 'সুখবাদ' প্রভৃতি গল্প।

'অভিমান' গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'নিরুপম' গল্পে দেখা যায় নায়ক

নিরুপমের জীবন প্রতিনিয়তই সংঘর্ষময়। তা সত্ত্বেও বাঁচার জন্য তার চরম আগ্রহ। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও সে অদৃষ্টের কাছে মাথা নত করেনি বরং মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তেও এরিকমারিয়া রেমার্কের লেখা 'অল্ কোয়ায়েট অনদি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' গল্পের নায়কের মতো সে বলেছে **'I won't die'**। তাঁর এই উক্তি নিরুকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। চরিত্রটির মুখে এই উক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতগুলি যেমন ফুটে ওঠেছে পাশাপাশি গল্পের তাৎপর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশালতার ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। 'অভিমান' গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'অন্তর্দ্ধান' গল্পে স্পিরিচ্যুয়ালিটি, রিয়ালিষ্টিক, চ্যালেঞ্জিং, ওরিজিনেলিটি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন আশালতা। 'অন্তর্দ্ধান' গল্পে লেখক অজিত অসিতাকে অ্যালডুস হাক্সলির বইও পড়তে দিয়েছেন। দেখা যায় অসিতা বালিশের নীচে অজিতার পড়া রোমারোলাঁর লেখা **'John Christopher'** বই দেখে। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' গল্পে ইংরেজি শব্দ **Suggestion, Charming, Overdose, Shallow, Horrible, Retionalised** ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়। গল্পটিতে আনাতোল ফ্রাঁসের কথাও আশালতা ব্যক্ত করেছেন। যখন মিনতিকে মুগ্ধ করার প্রচেষ্টায় সিতাংশু মেয়েদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ পুরুষদের চেয়েও বেশী এ প্রসঙ্গে বলতে যান তখন আনাতোল ফ্রাঁসের বলা কথাটি বলেন—

> *"মেয়েদের সংস্পর্শে এসেই আমরা সভ্য হয়েছি।*
> *মানে সৌন্দর্যের অন্তঃপুরে ঢোকবার পাসপোর্ট*
> *পেয়েচি।"*[৩৭]

এভাবে দেখা যায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লেখকদের কথা, তাঁদের রচিত গ্রন্থ এবং তাঁদের ব্যবহৃত উদ্ধৃতি তাঁর বিভিন্ন গল্পে স্থান পেয়েছে। 'আশঙ্কা'

গল্পটিতেও বিদেশি লেখক ও তাঁদের রচনার উল্লেখ রয়েছে। গল্পে দেখা যায় **University**-তে প্রথম হয়ে বোম্বে পড়াশোনার জন্য যাওয়ার আগে সুচরিতার সঙ্গে দেখা করতে এলে সুচরিতার মুখে শোনা যায় সেখানে গিয়ে সে যত খুশি এমার্সনের **'transcendentalism'** ও রাসেলের **'Mysticism and logic'** পড়ুক, কিন্তু যাতে বৃষ্টি ভিজে ইনফ্লুয়েজা না করে। অমলকে বিদেশী লেখক ডিলামেয়ারের, রোঁলারের, রবার্ট ব্রীজেস এর বই পড়তেও দেখা যায়।

গল্পে এসব বিভিন্ন লেখকদের বইয়ের উল্লেখ করা দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে আশালতা বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 'বড়বৌ' গল্পে আশালতা এইচ.জী. ওয়েলসের শ্রেষ্ঠ বই **'The Passionate Friend'** বইখানা উল্লেখ করেন। 'উমার তপস্যা' গল্পেও দেখা যায় গল্পের নায়িকা অমিতা বানভট্টের কাদম্বরীর সঙ্গে শেলীর লেখা কবিতাও পড়ে—

"..... Ah ! The Champak odour fails, as I must fall on thine ..." এছাড়া অমিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও টলষ্টয়ের উপন্যাসও পড়ে।

'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিয়ের পরে' গল্পেও আশালতা সেক্সপীয়র, শেলী, উইলিয়াম পিয়ার্সনের মতো কবিদের উল্লেখ করেন। এছাড়াও 'প্রশ্নপত্র', 'দেশেরকাজ', 'প্রেমেররূপ', 'নবযুগ' ইত্যাদি গল্পগুলিতে বিদেশী লেখক ও তাঁদের রচনার উল্লেখ রয়েছে। আশালতার বালিকাবয়স থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে অবাধে বিচরণ তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করে। তাই যখন তিনি গল্প লিখতে বসেন তখন তার পড়া অসংখ্য গ্রন্থ থেকে কখনও তথ্য হিসেবে আবার কখনও লেখকের গ্রন্থের উক্তিকে তাঁর গল্পকাহিনীতে এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যা কোথাও বিসদৃশ মনে হয়নি। আশালতা সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনকাহিনীকে যেমন তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে

উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের জীবন কাহিনীকেও লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার যাঁরা চাকুরির সুবাদে প্রবাসী তাঁদের জীবনযাত্রাকেও নিখুঁত বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে আশালতা যখন গ্রামবাংলার মানুষদের 'দাম্পত্য জীবন', 'পারিবারিক সম্পর্ক' নিয়ে লিখতে শুরু করেন তখন পাশ্চাত্য কবিদের লেখা গ্রন্থ বা তাঁদের উদ্ধৃতির প্রয়োগ আগের তুলনায় কমে আসে। আশালতার গল্পরীতির পরিবর্তনের এই ধারা সচেতন পাঠক সমাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আশালতার উপরোক্ত গল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক শ্রেণীর গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। যাকে বলা যায় গোয়েন্দা গল্প। 'রহস্যভেদ' গল্পে দেখা যায় অপরাধীকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ধরার মধ্য দিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটে। গল্পটি 'রংমশাল' পত্রিকায় পৌষ ১৩৪৭এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় ভালোমানুষির মুখোশের আড়ালে লুকোনো আছে লম্পট, খুনী, ডাকাতের মুখচ্ছবি। গয়নার লোভকে না সামলাতে পেরে বিনয়কুমার রায় নামে জুয়েলারির ম্যানেজারকে শৈলেন চৌধুরী হত্যা করে। পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিমানবিহারীর অনুসন্ধানে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এছাড়াও আশালতার কয়েকটি গল্পে শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও ভালোমানুষীর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভণ্ডামী, সংকীর্ণতা, স্বার্থন্বেষী মনোভাবের ছবি তুলে ধরেছেন। যেমন— 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের 'অন্তর্ভুক্ত', 'কাসুন্দি', 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বুদবুদ', 'স্বরূপ' প্রভৃতি গল্পে।

'কাসুন্দি' গল্পটি 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায়, ২৯ বৈশাখ ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে আশালতা বিজলীর মতো শিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা ও সমাজসচেতন নারীর চরিত্রকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। এই ধরনের শিক্ষিত, প্রগতিশীল মহিলারা যারা সমাজ উন্নয়নে বড়ো-বড়ো বক্তৃতা দিয়ে বাহাবা আদায় করে নেয়, অথচ বাস্তবে তারাই সেসব নীতি মেনে চলেন না। গল্পে দেখা যায় বিজলী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কলেজে রান্নাকে কম্‌পালসারি সাবজেক্ট করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখে এবং নানা যুক্তি দেখালে কর্তৃপক্ষ তার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারে। শেষপর্যন্ত কলেজে কম্‌পালসারি সাবজেক্ট

হিসেবে রান্নাকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তার ছিল রান্নার প্রতি অনীহা। বাড়ীর হরিচরণ খানসামা অসুস্থ হলে চা কিনে আনে বাড়ীর সামনের মোড়ের দোকান থেকে। অন্যদিকে দেখা যায় ঠিকা ঝি ভাতটা সিদ্ধ বসিয়ে বাজারে মাছ কিনতে যাওয়ায় বিজলীর সাধ্য হয়নি ফুটন্ত হাঁড়িকে নামানোর। সে অবস্থায় স্বামীকে ডেকে আনে এবং স্বামীর ওপর মাছের ঝোল বানানোর দায়িত্ব দিয়ে চলে যায়।

'স্বরূপ' গল্পে আশালতা তরলা ও তটিনীর মতো শিক্ষিত, আধুনিক নারী চরিত্র দুটির ভালোমানুষীর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বার্থন্বেষী, ভণ্ডামীর রূপটিকে উন্মোচিত করেছেন। 'স্বরূপ' গল্পটি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়, চৈত্র ১৩৪৫এ প্রকাশিত হয়। গল্পে দেখা যায় তরলা ও তটিনী শিক্ষিত, আধুনিক, সমাজ উন্নয়নে তাদের নজর। নারী সমিতি, মিটিংএ ধনী-দরিদ্রের সম-অধিকারের বক্তৃতা দেয়। কিন্তু বাস্তবে তারা অন্যরকম। তরলার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর শাশুড়ি তাদের বাড়িতে আসলে তার কুসংস্কার, আচার-বিচার সে মেনে নিতে পারে না। শাশুড়িকে বিদায় করার জন্য নানা ফন্দী পাতে। শাশুড়ি শেষপর্যন্ত মেয়ের বাড়ীতে চলে যেতে চায়। স্বামীর কাছ থেকে তরলা যখন জানতে পায় তাদের এখানে থাকলে পিতার এক লক্ষ টাকা তারা পাবে। একথা শুনে তরলা শত কষ্ট হলেও শাশুড়িকে তাদের কাছে রাখতে চায়। এখানে দেখা যায় তরলা মানবিকতার খাতিরে নয়, অর্থের লোভে শাশুড়িকে তাদের কাছে রাখতে চায়। অন্যদিকে তটিনী ধনী-গরিবের সম-অধিকার নিয়ে বর্ক্তৃতা দেয় অথচ তার স্বামী গরিব অনাথ ছেলেকে নিজের বাড়ীতে রাখতে চাইলে তটিনী রাজি হয়নি। আশালতা তরলা ও তটিনী চরিত্র দুটোর মধ্যদিয়ে সেসব মেয়েদের দেখিয়েছেন যারা ভালো-মানুষীর আড়ালে তাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখে স্বার্থান্বেষী মনোভাব, ভণ্ডামী, উদারতার আড়ালে কৃত্রিমতা। 'বুদবুদ' গল্পেও দেখা যায় আশালতা মীরার মধ্যদিয়ে এমন এক ধরনের নারীর চিত্র এঁকেছেন যারা নারী সমিতি,

সমাজ উন্নয়নমূলক নানা কাজ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে বক্তৃতা দেন। আবার তারাই বাড়ীতে রাঁধুনির সঙ্গে রান্না খারাপ হওয়ার কারণে দুর্ব্যবহার করেন। রাঁধুনির সঙ্গে মীরার এমন দুর্ব্যবহার দেখে এবং শ্রমিক উন্নয়নের কথা শুনে বান্ধবী সুহাসিনীর মনে হয়েছিল—

> *"ড্রইংরুমে পাখার তলায় বসিয়া বরফ দেওয়া সরবতে চুমুক দিতে দিতে শ্রমিকদের দুঃখ বুক ফাটিয়া যাওয়া খুব সোজা, কিন্তু সে কেবল ছেলেখেলা।"* [৩৮]

আশালতার কিছু গল্পে নীতিশিক্ষা বা শিক্ষামূলক ঘটনা চোখে পড়ে। যেমন— 'নবজীবন', 'বিনিময়', 'সফলতা' প্রভৃতি গল্পে। 'বিনিময়' গল্পটি 'পাঠশালা' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪৬ এ প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় ধনী পরিবারের সন্তান অশোকের সকল আবদার অভিভাবকরা মেনে নেন। সে বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয় তথাপি সে একা, অসহায় অনুভব করে। তার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। অশোকের সমবয়সীদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা থাকলেও বাধা হয়ে যায় তার বংশমর্যাদা, আভিজাত্য। সমবয়সীদের সঙ্গে অশোকেও বনভোজনে অংশগ্রহণ করতে দিলে অশোক রমাকে তার সমস্ত খেলনা দেওয়ার কথা বলে। গল্পটির মধ্য দিয়ে আশালতা দেখিয়েছেন অশোকের মনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে বাধা হয়ে পড়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের আভিজাত্য। পরিবারের কৃত্রিম আভিজাত্যের ফলে অশোকের মত শিশুদের শৈশব হারিয়ে যায়। পারিবারিক আভিজাত্যের চেয়ে একজন শিশুর মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা রাখে তার সমবয়সীদের সঙ্গ, কারণ একজন শিশুর শারীরিক বা মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বের হয়ে আসবে বাইরের জগতে আর সেখানে পাবে সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ। 'নবজীবন' গল্পটি 'পাঠশালা' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ এ প্রকাশিত হয়। গল্পে

দেখা যায় অভাবের তাড়নায় সন্তোষ মাকে মিছরির সরবৎ খাওয়ানোর জন্য ভদ্রলোকের পেকেট থেকে টাকা চুরি করার অপরাধে শাস্তি হয় কারাদণ্ড। একদিন রামরতন নামে প্রহরীকে আফিং খাইয়ে জেল থেকে পালিয়ে যায়। পদ্মডোবা গ্রামে এসে সে ধান ও তাতের ব্যবসা শুরু করে। মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ব্যবসা জমে ওঠে। সন্তোষ সেখানে স্কুল, ডাক্তারখানা তৈরি করে, গরীবদের দুর্দশামোচনে সবসময় এগিয়ে থাকে। একদিন ব্যবসার খাতিরে ট্রেনে যেতে রামরতনের সঙ্গে তার দেখা হয়। রামরতন তার সব কথা শুনে সন্তোষকে পুলিশে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তার কাছ থেকে প্রতি মাসে অন্ততঃ ১০০ টাকা সে পেতে চায়। সন্তোষ তখন পদ্মডোবায় তাকে আসতে বলে। সেখানে এসে সন্তোষের কথায় জানতে পারে ১০০ টাকার বদলে সে তাঁকে তার চালের আড়ৎ, ব্যবসা এক কথায় যথাসর্বস্ব দান করে দিয়ে সন্তোষ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়। সন্তোষের বিশ্বাসে আশ্চর্য হয় রামরতন। সন্তোষ রামরতনকে বলে—

"তুমিও জীবনে কষ্ট পেয়েছ, গরীবের কষ্ট বোঝ,
এর বেশি বিশ্বাস আর তুমি ছাড়া কাকে করবো?"[৩৯]

তখন রামরতন বুঝতে পারে কয়েদীদের শাস্তি দিয়ে, অপমান করে, অবিশ্বাস করে মূলস্রোতে ফেরানো সম্ভব নয়। বিশ্বাস ও ভালোবাসার জোরেই খারাপ মানুষকেও ভালো করে তোলা যায়। এখানে রামরতন নবজীবন লাভ করে।

আশালতার গল্পগুলির পর্যালোচনায় দেখা গেছে তাঁর গল্পের বিষয় প্রায় একই চক্রাবর্তনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। তবে কিছু কিছু গল্পের বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব গল্পের মধ্যে রয়েছে— 'গবেষণা', 'গরীবের অভিমান', 'মামার কাণ্ড', 'ওদের বিবেক বুদ্ধি', 'মোটর কেনা', 'প্রভাতের অশ্রুজল' প্রভৃতি গল্প।

'গবেষণা' গল্পটিতে আশালতা বিদ্যাচর্চার অন্তঃসারশূন্যতাকে দেখিয়েছেন। গল্পটি দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

'ওদের বিবেক বুদ্ধি' গল্পে আশালতা আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবগত করাতে চেয়েছেন। আশালতা বলতে চেয়েছেন মানুষের সচেতনতা না থাকলে বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীতে উপকারের চেয়ে বেশি অপকার হবে। গল্পটি 'রঙ্গিন আকাশ' পত্রিকায়, ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। 'মামার কাণ্ড' গল্পটি কৌতুক গল্প। 'আলপনা পত্রিকায়' ১৩৫২ সালে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি নির্মল নামে চরিত্রটির বিয়েকে কেন্দ্র করে গঠিত। 'মোটর কেনা' গল্পটি উত্তরা পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৪৮এ প্রকাশিত। মোটর কেনাকে কেন্দ্র করেই গল্পটি রূপায়িত। এসব গল্পের অধ্যয়নে এক অনন্য আশালতার সন্ধান পাওয়া যায়।

আশালতা সিংহের গল্পগুলিকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন তালিকাভুক্ত করে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে তাঁর গল্পের পরিধিতে রয়েছে তৎকালীন সমাজবাস্তবতা, আর্থ-সামাজিক দিক, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের নিঁখুত বিবরণ। যার মধ্য দিয়ে আশালতার সুন্দর, স্বচ্ছ, হিতৈষী, চিন্তাশীল মনোভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। আশালতার গল্পে যেমন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত উভয় পরিবারের জীবনচর্যার সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি শহর-গ্রাম উভয়স্থানের রূঢ় বাস্তবতা আমাদের সম্মুখে আসে। একজন স্রষ্টার প্রধান ধর্ম সৃষ্টির বাস্তব সত্য উদঘাটিত করে পাঠকমহলে তুলে ধরা। আশালতাও তাই-ই করেছেন। লেখিকার নিজের কথায়—

> *"জীবনের বাস্তব দিকটাতো আর দেখিনি। তাই ও নিয়ে লিখতাম না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কথাগুলি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। তিনি বলেছিলেন : 'শুধু সত্য কথা লিখলেই সাহিত্য হয় না। কল্পনা সেই সত্যকে বহন করে নিয়ে চলে। কিন্তু বনেদটা হতে*

হবে সত্যের উপর।' "[৪০]

আশালতার এই লিখনশৈলীর প্রশংসা করে ভাগলপুর শাখার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে আশালতাকে পত্র লিখে জানানো হয়—

> *"চিন্তাবৃত্তি প্রাচুর্য্যে ও চিন্তাশক্তির গভীরতা সত্ত্বেও আপনার রচনায় যে তারুণ্য সমৃদ্ধ আধুনিকতা পরিস্ফুট হয় তাহা আধুনিক লেখিকাগণের মধ্যে অতি বিরল।"*[৪১]

আর এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এখানেই তিনি অনন্যা।

উল্লেখসূত্র :

১. সংকলন- অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, , প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ- ১৪০

২. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৯৩

৩. সংকলন- অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৩৫৯

৪. দ্র. রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপকুমারের ৪নং চিঠি, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩, পৃঃ ৩৮

৫. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ২৮৪

৬. দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৯১, পৃঃ ৩৩৪

৭. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ৫০০

৮. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ১৫৬

৯. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ২০৯

১০. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৪৬

১১. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৬৫

১২. রাসসুন্দরী দেবী- আমার জীবন, দ্বিতীয় কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৫, দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ২৯

১৩. দ্র. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : পূর্বপত্র, এসসি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, জুলাই ১৯৬৩, পৃঃ ২১৩

১৪. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩৩৮

১৫. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৩৯

১৬. মনসিজ মজুমদার, পটে লিখা নারী, বঙ্গনারী ৯৮, ৩, ৪ ও ৫ জুলাই ১৯৯৮, পৃঃ ১৪৫

১৭. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, ভূমিকা অংশ (তপোব্রত ঘোষ) , পৃঃ ৪৪

১৮. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ১৪৪

১৯. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৬৭

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- গল্পগুচ্ছ, প্রথম দীপ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০২, দীপ প্রকাশন কলকাতা- ৭০০০০৬, পৃঃ ১০

২১. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পৃঃ ১৮৯

২২. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩৩৮

২৩. শৈলবালা ঘোষজায়া, অরু, ১৯৩৯, কলকাতা, পৃঃ ৩৮

২৪. কানাকড়ি, কলকাতা বইমেলা ২০০২, প্রাক্‌কথন, পৃঃ ৮

২৫. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩৩৭

২৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৬২

২৭. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২৩

২৮. রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয়

সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৫, পৃঃ ১৬

২৯. হুমায়ুন আজাদ, দ্বিতীয় লিঙ্গ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮, পৃঃ ৬৫

৩০. দ্র. মল্লিকা সেনগুপ্ত : স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৮, পৃঃ ৩০

৩১. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ৫৩৩

৩২. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩৮৭

৩৩. দ্র. ঐ, পৃঃ ১৩১

৩৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ২০৫

৩৫. ড. বিজিত ঘোষ, বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৮

৩৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ১১৪

৩৭. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, পৃঃ ১৪৭

৩৮. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ১৬০

৩৯. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩১৪

৪০. দ্র. সন্ন্যাসিনী আশাপুরী : কল্লোলযুগ, পর্দার আড়াল থেকে, শারদীয় কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৮৮, পৃঃ ৬৪

৪১. দ্র. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর ভাগলপুর শাখার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক আশালতা সিংহকে লিখিত পত্র